পথ-নির্দ্দেশ

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স

২০১, কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন। ১৩২৪।

মূল্য ১।০ টাকা

সাহিত্য জগতে সুপরিচিত

টাকীর জমিদার

খ্যাতনামা পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত গীষ্পতি চৌধুরী কাব্যতীর্থ

মহাশয়ের করকমলে

"পথ নির্দ্দেশ"

সাদরে উপহৃত

হইল

পথ-নির্দ্দেশ

[১]

শরতের শান্ত আকাশে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল, রক্ত ঠোঁট ফুলাইয়া পশ্চিমের সূর্য্য নিরাশার দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে, বাগানের সিক্ত টবের গন্ধ লইয়া মৃদু-মধুর বায়ু মন্থর গতিতে আনাগোনা করিয়া সরযূর কবরী নাড়িয়া দিতেছে। "আমি চলিয়া যাইতেছি" বলিয়া রমেশ দশমবর্ষীয়া বালিকার মুখ পানে তাকাইল।

"চলিয়া যাইবে—কেন?" এই বিস্ময়-মিশ্রিত স্বরে সরযূ মুখ কালি করিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ উত্তর করিল—"মাঠে গিয়া খেলিব, খোলা মাঠে ছুটাছুটি করিতে বড় ভাল লাগে।"

"এ বুঝি তোমার ভাল লাগে না" বলিয়া সরযূ মুখ ভার করিল, একটু থাকিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল—"তবে তাই যাও, আমায় কিন্তু আর খেলিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইও না" অভিমানে সরযুর ফোটা কুন্দ ফুলের মত সদা প্রফুল্ল মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; ডাগর কৃষ্ণতার চক্ষুদুটির কোণ ভরিয়া জল দেখাদিল, রমেশকে নিরুত্তর দেখিয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—"কৈ যাও না, দাঁড়াইয়া রহিলে যে।"

রমেশ মুচ্‌কি হাসিল, সরযূর খোপা ধরিয়া নাড়িয়া দিল। বলিল—"যদি না যাই।"

চুলের রাশটা বেণীবন্ধন ছিন্ন করিয়া কাল সাপের মত জানু পর্য্যন্ত বাহিয়া পড়িল, সরযূ উদ্ধত স্বরে বলিল—"তুমি আমার চুল খুলিয়া দিলে, মাকে বলিয়া দিব।"

রমেশ সরযূর হাত ধরিতে গেল,—"একটা গল্প বল না সরযূ" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"না আমি ত আর গল্প বলিতে চাহি না। মাকে গিয়া বলিব, রমেশ আর আমায় ভালবাসে না, মাঠে খেলা করিতেই ভালবাসে।" বলিয়াই সরযূ সলজ্জ কুণ্ঠায় মুখ নত করিল। তাহার আরক্তিম মুখ ঘামিয়া উঠিল।

রমেশ সরযূর কাপড়ের আঁচল ধরিয়া নাড়িয়া দিল,—"মাকে কিন্তু কিছু বলিও না সরযূ।" বলিয়া সেই সান্ধ্য আকাশের মতই নির্ম্মল রক্তবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নিজের অজ্ঞাতে চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সরযূ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"যদি রাগ করেন, দুঃখ পান।"

সরযূর বড় হাসি আসিল, সে হো হো করিয়া হাসিয়া রমেশকে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া বলিল—"তাই না, তোমার যে বুদ্ধি, এবে আবার মা রাগ করিতে পারেন!"

"আমার যে সত্যিকার মা নেই সরযূ, আমি বড় অভাগা, তাই ত ভয় হয়।"

"সে কি?" বলিয়া সরযূ ব্যথাভরা প্রাণে সমবেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। বেদনাভরা কণ্ঠে উত্তর করিল—"তুমি ত তাঁকে কত ভালবাস, ভক্তি কর।"

"ভালবাসি।" বলিয়া রমেশ থামিল, আপন মনে আপনি বলিতে লাগিল—"ভালবাসার আমি কি জানি তিনি যে আমার কে, কতখানি, সে ধারণাও ত আমার নাই।"

"চুপ করিয়া কি অত ভাবিতেছ?" বলিয়া সরযূ অর্থহীন কথায় আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা তুমি মাকে বেশী ভালবাস না আমাকে—"

"সে কথা কেন?"

সরযূ জেদ ধরিল, বলিল—"না, তোমায় বলিতেই হইবে।"

রমেশ উত্তর করিল না, সরযূ আবারও মুখ ভার করিয়া বলিল—"বুঝিয়াছি, তুমি মাকেই বেশী ভালবাস। আমি তোমার কেউ ... আচ্ছা আড়ি, আর তোমাদের বাড়ীতে আসিব না।"

... ফুল লইবে?"

...খ তুলিল না, রমেশ ছুটিয়া গিয়া টবে সাজান চারাগাছ ... ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিল, এমন রোজ আনিত, ...য় পরাইত; আজও ফুল লইয়া খোপায় পরাইতে গেল,

সরযূ মাথা সরাইয়া লইল, ধরা গলায় বলিল—"না না ফুলে ত আমার প্রয়োজন নাই, তুমি যাকেই ভালবাস, তাঁহাকেই ফুল দিয়া আসিবে। আমি ও লইব না, আর এখানে আসিবও না, তুমি মাঠে গিয়াই খেলা করিবে।"

বালিকার এ কি অভিমান, রমেশ তাহা ভাবিয়া পাইল না, গম্ভীর হইয়া বলিল—"লইবে না ত, ফুলগুলো আমি ফেলিয়া দিতেছি, পরে কিন্তু আমায় আর কিছু বলিতে পারিবে না।"

সরযূ ফুল বড় ভালবাসিত, এই ফুলগুলি যে তাহার খোপায় উঠিয়া সুগন্ধ ছড়াইবে, পুতুল খেলার সাহায্য করিবে। উঠিয়া গিয়া রমেশের হাত ধরিয়া বলিল—"না না ফেলিও না, ও আমি নিতেছি, তার আগে কিন্তু তোমায় বলিতে হইবে, তুমি আমায় খুব ভাল বাসিবে।"

রমেশ এবার উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। এই অর্থহীন হাসি সরযূর গায়ে বিঁধিল। ভালবাসার কথায় উপহাস, দশমবর্ষীয়া বালিকাও ইহা সহ্য করিয়া উঠিতে পারিল না। জোর করিয়া রমেশের হাতের ফুলগুলি কাড়িয়া আনিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

রমেশ পিছন হইতে ডাকিল—"সরযূ শোন?"

সরযূ ফিরিল না, মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * *

অন্য পথ ঘুরিয়া সরযূর পূর্ব্বেই রমেশ এ বাড়ীতে আসিয়া শীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"দেখ মা, সরযূ ভারি দুষ্ট য়াছে, আমার এত সাধের ফুলগুলা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।"

সুশীলা রমেশের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে লিলেন—"ও যে তোমার ছোট রমেশ, অন্যায় করিলে সে ত মায় সহ্য করিতে হইবে।"

পরে আসিয়া সরযূ দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাগুলিই শুনিতেছিল, ঠোঁট ফুলাইয়া এবার সে বলিল—"অন্যায় আমি করিয়াছি,—না! কেন রমেশ যে বড় আমায় ঠাট্টা করিয়া হাসিতেছিল।"

সুশীলা সস্নেহ ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন—"তুমি মা বড় দুষ্ট হইয়াছ, এমন করিয়া নাকি ফুলগুলা ফেলিয়া দিতে হয়, নয়ত ও একটু হাসিয়াই ছিল।"

সরযূ ফুলিয়া ফোঁকাইয়া কাঁদিতেছিল, তাহার গণ্ড বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রমেশ ইহা সহ্য করিতে পারিল না, সরযূর হাত রিয়া বলিল—"কেঁদ না, আমারই অন্যায় হইয়াছে, আর ত কখনও মন কাজ করিব না।"

সরযূ হাত ছিনাইয়া লইল। সুশীলা হাসিয়া বলিলেন—"রমেশ, র কিন্তু তোমার হার হইল, নালিশ করিতে আসিয়া শাস্তির ভা নিজেই আপোস করিতেছ।" সরযূকে ডাকিয়া বলিলেন—

"আয় মা ; রমেশের ও'পর নাকি রাগ করিতে আছে, ও যে তোকে কত ভালবাসে।"

সরযূ সে কথায় কাণ দিল না। রমেশ বলিল—"মা আমি আজ যাত্রাগান শুনিতে যাইব, সরযূ যায় ত লইয়া যাইতাম।"

"আচ্ছা, আমি অমন যাই না।" বলিয়া সরল মুখখানার উপর কুটিল কটাক্ষ টানিয়া আনিয়া সরযূ রমেশের দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রমেশ বলি ে লাগিল—"ও পাড়ায় আজ কত কি হইবে, যাত্রাগান, পুতুল নাচ।"

পুতুল নাচের নামে সরযূর মন লাফাইয়া উঠিল। সে এতটা উপেক্ষা করিতে পারিল না, জোর দিয়া বলিল—"আমি নয় ত রতনকে সঙ্গে করিয়া যাইব।"

"যাও ত আমিই তোমায় লইয়া যাইব, রতনকে আবার কেন বলিতে যাইবে!"

সরযূ হার মানিল, হাসিয়া ফেলিয়া রমেশের হাত ধরিয়া ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সুশীলা হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া আপন মনে আপনি বলিয়া উঠিলেন—"আহা কি সুন্দর মানাইয়াছে।"

দূর আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিল, আশেপাশের বাড়ীগুলি ধূম্রবর্ণের প্রাকারপরিবেষ্টিত সেনানিবাসের মত ভীতিহীন, নিশ্চল।

সুশীলা চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে ছাদের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাতে হাত রাখিয়া রমেশ ও সরযূ সেই নৈশ আকাশের দিকে তাকাইয়া পুলকিত অন্তরে হাসিতেছে।

[২]

দীর্ঘ কালের নিবীড় বন্ধন ছিন্ন করিয়া সরকারী চাকরী যেদিন পূর্ব্বকৃত শত্রুর মত ইন্দুমাধব বাবুকে কলিকাতার বাড়ী ছাড়া করিয়া বিদেশবাসী করিল, সেদিন সুশীলা, সরযূ ও রমেশের মনের মধ্যে একটা করুণ হাহাকার গুমরিয়া উঠিতেছিল। এত-কালের একনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠতার ফলে ইহাদের হৃদয়ে যে স্নেহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পত্রপল্লবে সুশোভিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, দেবতার কঠোর বিধান যেন তাহার মূল শুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। অপরিস্ফুটবাক্ বালিকার মত সরযূ সহসা কোন কথাই বলিতে পারিল না, সলজ্জ গাম্ভীর্য্য তাহার বুকের কথাটা মুখের গোড়ায় আনিতে দিল না। রমেশ পিতাকে গিয়া ধরিল, বলিল—"আমায় এখানেই রাখিয়া যাও বাবা, বিদেশে পড়াশুনার বড় ক্ষতি হইবে।"

ক্ষতিবৃদ্ধি যে কোন্ দিক্ দিয়া কত হইবে, ইন্দুমাধব বাবু তাহা না ভাবিয়াই উত্তর করিলেন—"আপাতত অন্য বন্দোবস্ত ত ... ম করিয়া উঠিতে পারি না, এখন যাচ্ছ যাও, পারিত এরপর ... করিয়া দেখিব।"

রমেশ বসিয়া পড়িল, তবু কিন্তু পিতার কথার উপর সে কথাটি বলিতে পারিল না। সুশীলা ডাকাইয়া ইন্দুমাধববাবুকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"রমেশের মা মারা গেলে ছোট কাল হইতে আমিইত ওকে এতটা বড় করিয়াছি, আমার কাছেই কেন রমেশকে রাখিয়া জান না।"

ইন্দুমাধব বাবু অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। এই পুত্রটিকে কেন যে তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে চান, তাহা না বুঝিয়া না ভাবিয়া সুশীলা আবারও বলিলেন—"আপনার মত হয় ত, সরযূকে রমেশের হাতেই—"

অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া ইন্দুমাধববাবু বলিয়া উঠিলেন—"অমত ত এমন কিছু নাই, তবে কি জানেন, আমি পাচ সাত বছরের মধ্যে ওর বিবাহই দিব না।"

আঘাতটা অপমানের বোঝা লইয়া সুশীলাকে তীব্রভাবে বিঁধিল, তিনি আর এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি না করিয়া অন্য কথা উঠাইয়া একথা সে কথার পর ইন্দুমাধব বাবুকে বিদায় করিলেন। পক্ষীর পক্ষপুটের ন্যায় যে স্নেহের আশ্রয়ে তিনি শাবকের মতই এই রমেশকে মানুষ করিয়াছিলেন, সময় উত্তীর্ণ জানিয়া ইন্দুমাধব যে সেই স্নেহটাকে এভাবে উপেক্ষা করিতে পারিবেন, ইতি পূর্ব্বে এক দিনের জন্যও এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই, কাজেই তাঁহার হৃদয়ের ব্যথাটা একটু বেশী রকমেরই হইল। সমস্ত গায়ে লজ্জা

মাথয়া সরযূ আসিয়া পাশে দাড়াইল, অনুযোগ করিয়া বলিল—
না, বল ত তুমি, কেন অমন অনুরোধ করিতে গিয়াছিলে?”

মাতা কন্যার মুখের দিকে তাকাইলেন। দ্বৈধীভূত চিন্তায় সরযূর
সুমস্তকুমার মুখখানা শুকাইয়া কাল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের
যোগপথে বাধাপ্রাপ্ত শৈলনিঃসৃত নির্ঝরিণীর মত তাহার শরীরের
বয়বগুলি যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তবু সে আত্মাকে
য করিবে, সরযূ আবার বলিল—“তুমি যেন আর ও-কথা মুখেও
নিও না, অকৃতজ্ঞের বোঝা ঘাড় পাতিয়া লইতে গেলে, সে যতই
হাল্কা হ'ক, পীড়ন না করিয়া ত ছাড়ে না।”

রমেশ ডাকিল—“সরযূ।”

সরযূ দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সুশীলা চলিয়া গিয়াছেন।
লিল—“বল কি বলিতে আসিয়াছ?”

আঘাতটা রমেশ সামলাইয়া লইল, প্রতি আঘাতের চেষ্টার
লেশও তাহার মনে স্থান পাইল না, বলিল—“দেখিতেছ ঐ আকাশ
সুন্দর, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, উদার, অনন্ত, উহাতে কৃত্রিমতা নাই,
নাই, হিংসাদ্বেষ নাই, অযথা আভিজাত্যের উন্মাদনা নাই,
মনে আপনি বিভোর, আপন গর্ব্বে আপনি নত।”

দেখিতেছি” বলিয়া সরযূ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মানুষের মন কেন এমন হয় না, বৃথা হিংসা, দ্বেষ,
মান যে তাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য লোপ করিয়া দেয়।”

সরযূ কথা বলিল না, একবার নীল আকাশের দিকে, আর একবার রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ নত করিল। রমেশ কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তুমিত বুঝিতেছ না, আমার মনে কি হইতেছে।"

"বুঝিতেছি" - বলিয়া সরযূ থামিল, একটা করুণ কটাক্ষ করিয়া হৃদয়ের ভাবটা ব্যক্ত করিল। রমেশ নূতন উত্তেজনায় উন্মাদনা-পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল—"না সরযূ, সে ত তুমি বুঝিতে পার না, আমার প্রাণের বেদনা, আকুল কান্না, সে যে কাহারও বুঝিবার নয়, সে ত হৃদয়ব্রণের মত আমায় দগ্ধ করিতেছে।"

"উপায় ত নাই।"

"নাই বলিলে চলিবে না, উপায় তোমার হাতে, তোমাকে তাহা করিতেই হইবে।"

"আমার হাতে" বলিয়া সরযূ বিদ্রূপপূর্ণ ব্যথিত হাসি হাসিতেছিল, সহসা সে বসিয়া পড়িল, ঈষৎ বিভক্ত ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছিল, আপন মনে আপনি বলিতে লাগিল—"আমার হাতে, শক্তি থাকিতে ত নিজের প্রাণ বলি দিয়া কেহ আমোদ অনুভব করে না।"

রমেশ বলিল—"মান অভিমান ভুলিয়া মা যদি আর একবার অনুরোধ করেন।"

সরযূ উদ্ধত স্বরে উত্তর করিল—"সে কি করিয়া হইবে! না না, সেত হইতেই পারে না, তিনি কেন বারবার অপমানের বোঝা ঘাড় পাতিয়া লইতে যাইবেন!"

রমেশ কথা বলিল না, সরযূ ভাবিতে লাগিল, সাধ্য যে নাই, তাহা ত রমেশকে সে বোঝাইতে পারে না, হৃদয় ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়, সেও সরযূ স্বীকার করিতে পারে, তবু মাতার পক্ষে অপমানজনক এমন কাজ সে প্রাণ থাকিতে অনুমোদন করিতে পারে না। অভিশপ্তের মত তাহার এ অন্তর্জ্জালা হয়ত অন্তর দগ্ধ করিবে, তবু এমন অকৃতজ্ঞের নিকট প্রার্থনা বা অনুরোধ করিতে সে মাতাকে বলিতে পারিবে না। রমেশের যদি অনুভূতি থাকিত ত সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইত, এখানে সরযূর কোন শক্তি নাই, কোন সাধনাই তাহাকে শক্তিমতী করিতে পারে না। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"বিধাতার ইচ্ছা, আমাদের এ খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেল; আকাশকুসুমের চিন্তা মন হইতে তুলিয়া দাও।"

"কিন্তু সরযূ তুমি,—তোমায়"

তোমারও ত পিতার ইচ্ছার বাধ্য হইয়াই চলা উচিত।"

সরযূ কাঁপিয়া উঠিল।

শের চোক মুখ কেমন অস্বাভাবিকভাবে লাল হইয়া

ল, সরযূ দেখিল, সে মুখ কি কাতর, কত হতাশ-পীড়িত, পায়; সমস্ত মুখে, শরীরের প্রতি অঙ্গে যেন সর্ব্বস্বান্তের

লক্ষণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এত করুণ, এত ম্লান, এত তাপপ্রদ মুখ ত সে আর কখনও দেখে নাই। সরযূ উপরে দৃষ্টি করিল, শান্ত আকাশের শান্তিময় ভাব যেন তাহার মনে এককালে সান্ত্বনা ও বল আনিয়া দিল। সে জোর দিয়া বলিল—"অত ভাবিও না, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার হৃদয়ে সাহস থাকিবে, পুরুষের বৃত্তিই যে কঠোর, উহা ত সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিবার জন্য নহে, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তোমাদের আশাভরে নত মনকে ধরিয়া তুলিবে, আকাঙ্ক্ষা সে ত পুরুষের পুষ্টির জন্য নহে, সে যে কর্ত্তব্যের দাস হইবে। তুমি আশ্বস্ত হও, ভগবান্ যাহা করেন, তাহাই হইবে।"

তন্ময় হইয়া ষোড়শবর্ষীয় যুবক সংসারপথের নূতন পেষণে পিষ্ট হইতে গিয়া ত্রয়োদশবর্ষীয়া সরযূর কথাগুলিই প্রাণ ভরিয়া শুনিতেছিল। বালিকার এ উপদেশ কি দৈব আশীর্ব্বাদ, এবার সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"তবে তাই, আমি তোমার কথায়ই নির্ভর করিব, দেখি ভগবানের করুণা যদি লাভ করিতে পারি।" রমেশ থামিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন কারুণ্য ছড়াইয়া দিল। আবার বলিল—"তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ সরযূ, পৃথিবী যদি আমায় ত্যাগ করে, ভুলিয়া যায়, তুমি যেখানেই থাক, যে ঘরেই যাও, সুখদুঃখে মুহূর্ত্তের জন্য এ অভাগাকে একবার মনে করিও, আমি তোমার স্মৃতি মনে রাখিয়াই প্রাণ ধারণ করিব।" বলিয়া রমেশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

[৩]

বিবাহের সম্বন্ধ পাকারকমে স্থির করিয়া মাতা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—"সরযূ, তোমায় মা আজ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবে।"

সরযূ বার দুই শিহরিয়া উঠিল, অস্বাভাবিক স্বরে বলিল—"আচ্ছা মা, আমার কি খিদে পায় না, তোমার যেমন দুপুর পর্য্যন্ত স্নান করিবারও নাম নাই।"

"তুই খা গিয়া সরযূ" বলিয়া সুশীলা ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সরযূ তপ্ত স্বরে বলিয়া বসিল—"তুমিই যদি না খাইয়া থাকিতে পার, আমিই বা তোমায় ফেলিয়া খাইতে যাইব কেন?"

"কি করিব মা, পাঁচ জন বাড়ীতে আসিবে, একটু চেষ্টাচরিত্র করিলে যে হয় না।"

কন্যা যেন মাতার প্রস্তাবটা ভুলিয়াই গিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া—"কে কে আসিবে মা!"

তা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"এই বরের বাপ, আর—"

মধ্যপথে দিশাহারার মত জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা

হইলেই কি হয় না?"

"কি" বলিয়া সুশীলা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, সরযূ কোনই উত্তর করিল না। ব্যাপারটার গোড়া পর্য্যন্ত তলাইয়া সুশীলা এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"ছি মা, তোর মুখে কেন এমন কথা, তুই ত আমার বোকা মেয়ে নস, অনেক চেষ্টা করিয়া তবে আমি এ সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছি, তুমি কিন্তু এতে না বলিও না।"

"আচ্ছা তুমি চান করিতে যাইবে কি না বল ত।" বলিয়া সরযূ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল।

অপরাহ্নে সুশীলা ডাকিয়া বলিলেন—"রতন, দেখ ত বাপ, তোর সরযূদিদি কোথায়, তাকে একবার ডাকিয়া দে, আর বৈঠকখানা ঘরটা ঝাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখ, সন্ধ্যাবেলায় বাবুরা আসিবেন।"

পাশের ঘরে সরযূ মায়ের আহ্বান শুনিলেও মূকের মত পড়িয়া রহিল, রতন ডাকিতে গেলে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"যা না তুই! কেন তোর কি আর কোন কাজ নাই যে, এখানে চীৎকার করিতে আসিয়াছিস্।"

"মা যে ডাকিতেছেন।" বলিয়া রতন অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইল।

সরযূ বলিল—"মাকে গিয়া বল, আমার অসুখ করিয়াছে, আমি এখন যাইতে পারিব না।"

সুশীলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অসুখ করিয়াছে মা?"

সরযূ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, মাতার বিবর্ণ মুখের দিকে

চাহিয়া সে যেন নিজের কথা ভুলিয়াই গেল, বলিল—"কৈ আমার ত কোন অসুখ করে নাই, আমি বেশ আছি।"

সুশীলার বুকের তরল রক্তগুলি জমাট হইয়া আসিতেছিল। কন্যার এই সযত্ন গোপন যেন তাহাকে বারবার ঝাকানি দিতেছিল। অতিকষ্টে এবার তিনি বলিলেন—"আমি সবই বুঝিতেছি না, আমাকে ত ফাঁকি দিতে পারবে না, কিন্তু কি করিব, যা হ'বার নয়, তা থেকে ত তোর মন ফিরাইতেই হইবে।"

সরযূ জবাব দিল না, সুশীলা আবার বলিলেন—"তোর বয়স হইয়াছে, আর ত বিয়ে না দিলে চলে না, মনের কষ্ট যদি ভুলিতে হয় ত একটা আশ্রয় যে চাই, তাই ত এত তাড়াতাড়ি করিতেছি. আমায় আর কষ্ট দিস্ না, রমেশকে তুই ভুলিয়া যা।"

কার্ব্বলিক এসিডের স্পর্শে সাপ যেমন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, সরযূর প্রাণটা তেমনি করিতেছিল, সে উত্তেজিত স্বরে বলিল—"কে ভাবিতেছে তোমার রমেশের কথা, অমন অকৃতজ্ঞকে কেউ ন স্থান দেয় না, সে যে ডালে বসিয়া গাছ কাটিতে চায়।" রপর থামিয়া একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"তুমি যাতে হও, আমি তাহাই কর্‌ব, তোমাকে নাকি আমি কষ্ট দিতে

য় নারী, তোমার হৃদয় যে কতখানি তাহা ত এ দুর্ভাগ্য ঝিল না, ইহারা জানে শুধু নিজের সুখ-সৌভাগ্য, মাতৃত্বের

মর্য্যাদা, মানসম্ভ্রম লইয়া চিন্তা করিবার অবকাশ এ সমাজের নাই, তোমার ভালবাসা যে কত উদার, ত্যাগ যে কত মহিমময়, সৌজন্য যে কত উচ্চ, তাহা ভাবিবে বুঝিবে, এমন শক্তি, এত সাহস স্বার্থপর আত্মসুখলিপ্সু সমাজের ত থাকিতে পারে না, তুমি যে দয়ায় মাতৃস্বরূপা, রোগসঙ্কটে বন্ধুরও অধিক, পরিচর্য্যায় দাসী; বিশ্বাসে মাতৃস্নেহের মত, ত্যাগে যে তোমার আদর্শ এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই, তাহা কি অন্ধ দুর্ব্বল মানবের মন বুঝিবে! তোমার মহিমা যে কতখানি, জলধির মত গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত তোমার সুখ-দুঃখ যে মানব-মনের অতুলনীয় রত্ন, তোমার যশ, তোমার গৌরব যে মানুষকে গৌরবময় করিয়া তুলিবে, সে ভাগ্য এই ভাগ্যহীন সমাজে কাহারও বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; এই ত্যাগের মন্ত্র, মাতৃভক্তির অচল আদর্শ, সুশীলার প্রাণের কোণে নিবীড় ভাবে আঘাত করিল, তাহার চোখ দিয়া জল আসিতেছিল, কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া সুশীলা বলিলেন,—"তাই কর মা, আমি যা করিব, সে তোমার মঙ্গলের জন্য, এ বিশ্বাস যেন হারাইও না।"

সুশীলা চলিয়া গেলে সরযূ একটা বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া একবর্ণও সে বুঝিতে পারিল না, অথচ শ্রান্ত হইয়া পড়িল, পুস্তকখানা ফেলিয়া সরযূ চোখ বুজিল অন্ধকার রাত্রিতে জোনাকির মত তাহার হৃদয়ের এ কোণে ও কে

রমেশের রূপ, কার্য্য, আদর ও আগ্রহ যেন উঁকি দিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। পাশের বাড়ীতে রমেশ যে ঘরে থাকিত, সে ঘরে গিয়াই সরযূ পড়িয়া আসিত, কতকাল ধরিয়া কতবার যে সে কারণে অকারণে কত আনাগোনা করিয়াছে; তাহার ত সংখ্যা ছিল না, এক দিনে এক মুহূর্ত্তে তাহার যাতায়াতটা বন্ধ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফুরাইল,—উলটপালট হইয়া গেল; রমেশ এক দিন সরযূকে না দেখিলে ছুটিয়া আসিয়াছে, সরযূও একদণ্ড রমেশকে না দেখিলে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। এক দিনের নয়, এক বৎসরের নয়, আবাল্য যে হৃদয় দুটি পরস্পর মুখামুখি চোখাচোখি করিয়া দিন রাত্রি, একে অপরের আরাধনা করিয়া আসিয়াছে, স্বপ্নের মত চোখ চাহিতেই তাহা মিলাইয়া গেল, যত্নগ্রথিত মুক্তার মালাগাছা একটা হিংস্র জন্তুর নখরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আশা গেল, আশ্বাস রহিল না, তবু ত সরযূ তাহার আকাঙ্ক্ষার বোঝা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে না, সে যে ভার হইয়া সরযূ মাথা হইতে বুক পর্য্যন্ত চাপিয়া রহিয়াছে। সহসা সরযূর চোখ ছাপাইয়া জল বাহির হইল, সে কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া পরের ঘর করিবে? একমাত্র মাতার অনুরোধে,—তাঁহারই সুখের আশায় সে যে এত বড় দুঃখকে বরণ করিয়া লইতেছে, এই দুঃখ কি সরযূর দুর্ভাগ্যটাকে ... যা উঠিতে পারিবে, সে সাহস, তেমন শক্তি কি তাহার নাই। ... পাইয়া হঠাৎ যেন সরযূর অন্য চিন্তা মনে আসিল। মনে মনে

বলিতে লাগিল—"কেন পারিব না, এ যে আমায় পারিতেই হইবে, স্ত্রীজাতি, দুঃখকে বরণ করিয়া লইবার জন্যই যে এ দুর্ভাগ্য দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মায়ের হাসি মুখ দেখিবার জন্য মেয়ে হইয়া আমি জীবন পণ করিব, এ যে অতি সামান্য কথা।"

সুশীলা ডাকিলেন,—"সরযূ আয় মা, তোর চুলটা বাঁধিয়া দি।"

সরযূর ভারি রাগ হইল, সাজিয়া গুজিয়া যাচাই হইতে যাইতে হইবে ছিঃ, কিন্তু বাধা দিলে মা বিরক্ত হইবেন, আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া পড়িল।

পাশের বাড়ীর ঘরে ঘরে নূতন ভাড়াটিয়ার: জ. া. া খুলিয়া দিয়াছিল, সরযূ সেই পূর্ণ বাড়ীটাকে শূন্য মনে করিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘ শ্বাসে কম্পিত বক্ষটাকে আরও কাঁপাইয়া স্পন্দিত স্বরে বলিল,—"যাই না।"

[৪]

পিতার কার্য্য স্থলে উপস্থিত হইয়াই রমেশ বলিল—"এ জায়গা ত আমার ভাল লাগে না, আমায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও বাবা।"

ইন্দুমাধববাবু বিস্মিত হইলেন, রমেশের কলিকাতার প্রস্তাবে তাহার মনের কথাটা ধরা পড়িয়া গেল। তিনি স্থির কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"দেখ রমেশ, আমি ঠিক করিয়াছি, তোমায় মধুপুরে রাখিব, কিছুদিন হইতে তোমার শরীর ভাল যাইতেছে না, সেখানে.

আমার এক বন্ধু আছেন, তুমি তাঁহার বাসায় থাকিয়া ইচ্ছা করিলে পড়াশুনাও করিতে পারিবে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে, আমাকেও কোন চিন্তা করিতে হইবে না।"

রমেশ এক মুহূর্ত্ত নীরবে রহিল, কি ভাবিয়া বলিল—"কলিকাতায় আমি এত কাল থাকিয়া আসিয়াছি, এত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় রহিয়াছে, সমস্ত ছাড়িয়া এই নির্ব্বাসন সহ্য করা আমার পক্ষে বড় দায় হইবে।"

ইন্দুমাধববাবু অটল, তিনি এবার প্রাণ খুলিয়া কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—"হয় তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে, নয়ত মধুপুরেই যাইতে হইবে, কলিকাতায় তোমাকে আমি এখন পাঠাইতে পারি না। সরযূর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইতে পারে না, তারা ছোট ঘর, তাইত তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

এই পরিষ্কার কথাটা পিতার মুখ হইতে শুনিয়া রমেশ তাঁহার ক্রূরতার জন্য মনে মনে রাগিয়া লাল হইয়া উঠিল। বিষদন্তহীন সর্পের মত তাহার নিষ্ফল গর্জ্জন ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া অন্তরের পীড়াই বাড়াইল। ইন্দুমাধব তাহা বুঝিতে পারিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

ঘণ্টা দুই পরে চাকরের মাথায় ট্রাঙ্ক চাপাইয়া দিয়া রমেশ পিতাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আমি চলিলাম, কোথায় যাইতে হইবে বলিয়া দিন।"

বিস্ময়-ব্যাকুল নয়নে ইন্দুমাধববাবু পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আজ না গেলেই কি নয় রমেশ, দু'দিন সবুর কর।"

"না বাবা, এখানে আমার মন তিষ্ঠিতেছে না, তুমি আর আমায় বারণ করিও না।" বলিয়া সে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

মধুপুরে রমেশ পিতার বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া হাপ ছাড়িল। এ স্থানটা তাহার নিতান্ত মন্দ লাগিল না, সঙ্গিহীন হৃদয় আত্মীয় বন্ধুবিহীন নিরব নির্জ্জন স্থানেরই খোঁজ করিতেছিল; বিধাতা তাহা মিলাইয়া দিয়া যেন তাহাকে মুক্ত করিলেন। অনেকদিন পরে রমেশ আজ এই অপরিচিত স্থানে পেট ভরিয়া খাইল, আরামে ঘুমাইল। অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইয়া তাহার মনের ভারটা বার আনা রকমের হাল্কা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে টেবিলের উপর আলো রাখিয়া জানালাপথে রমেশ বাহিরের জমাট পাকান অন্ধকার দেখিতেছিল, সেই নীবিড় ছিদ্রহীন অন্ধকারের মধ্যে বিরলসন্নিবিষ্ট গাছগুলি মাথা উচু করিয়া প্রেতের মত হাসিতেছে, গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে জোনাকি পোকাগুলি যেন প্রেতবদনের উপর দীপ্যমান চক্ষু। রাত্রির মন্দ বাতাস দূর দিগন্ত হইতে পুষ্প গন্ধ লইয়া জানালাপথে ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেছিল, রমেশ নিমেষহীন দৃষ্টিতে মধুপুরের সে

অন্ধকার রাত্রির অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মনের মধ্যে একটা হর্ষ, একটা বল পাইল। পিছন হইতে কোমল কণ্ঠের ডাক আসিল—"রমেশবাবু।"

রমেশ মুখ ঘুরাইতেই দেখিল, একটি ডাগর সাদা মেয়ে তাহার কৃষ্ণতার বিস্তৃত চক্ষু দুটি রমেশের দিকে স্থির রাখিয়া একখানা পুস্তক হাতে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ সুবাসিত চুলের রাশ কালসাপের মত পা পর্য্যন্ত নামিয়া পড়িয়াছে। উত্তর করিবার পূর্ব্বেই মেয়েটি বলিল—"বাবা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, বইএর এই যায়গাটা আমায় বুঝাইয়া দিতে হইবে।"

মেয়েটির এই নির্ভীক অপ্রত্যাশিত আচরণে রমেশ বিস্মিত হইল, একটা কুণ্ঠাও যেন ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল, এ আবার কি ঝঞ্ঝাট, মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি মোহিনীবাবুর কন্যা।"

"হাঁ আমি তাঁরই মেয়ে? নাম আমার কমলা, এখানকার স্কুলে আমি পড়ি।"

"কোন্ শ্রেণীতে পড়েন আপনি?" বলিয়া রমেশ সোৎসুক-নেত্রে উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কমলা বলিল—"আমি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছি, এখন হইতে মাঝে মাঝে আপনার কিন্তু আমাকে সাহায্য করিতে হইবে।" বলিয়া সে সামনের চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

রমেশ বলিল—"আমি ত আজই এখানে আসিয়াছি, শরীর বড় শ্রান্ত, কাল হইতে আপনার সাহায্য করিলে কি চলিতে পারে না?"

"কেন চলিবে না, আপনার অসুবিধা হয় এমন কোন কাজ করিতে যে বাবা আমাকে বারণ করিয়াছেন। আজ নয় ত পড়ার কথা চাপাই থাকুক। বলুন ত একাকী বসিয়া আপনি অত কি চিন্তা করিতেছেন?"

রমেশ ছোট্ট একটি শ্বাস ত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"মানুষের কতই না চিন্তা করিতে হয়, সংসার জীবন-যুদ্ধের স্থান, এখানে চিন্তা করিয়া—সতর্ক হইয়া পা বাড়াইতে না পারিলে যে পদে পদেই হারিতে হইবে।"

কমলা রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—"বাবা কিন্তু ঠিক এর বিপরীত বলেন, সংসারে আমরা আসিয়াছি, দুদিনের জন্য বেড়াইতে, সুখস্বচ্ছন্দে থাকিব বলিয়া, এখানে চিন্তা ভাবনা যে করিবে, সেই হারিবে, যত পার সকল ভুলিয়া মনের আনন্দে থাক, দুদিন পরে যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইব না, তাহার জন্যে আর ভাবিয়া বিবেচনা করিয়া মনের ভার বাড়াইতে যাই কেন?"

অবিবাহিতা বয়স্থা কমলার এই অকুণ্ঠিত আচরণ রমেশের চক্ষে নূতন ঠেকিতেছিল, সে ক্ষণিকক্ষণ মৌন চিন্তার পর বলিয়া উঠিল—"আপনার বাবা যাহা বলেন, হয়ত তাহাই সত্য, ঐভাবে

ভাবিতে পারিলে সংসারে একটা সুখের পথ দেখিতে পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখুন কি দুর্ভাগ্য মানুষের, সবাই এক রকম করিয়া ভাবিতেও পারে না, কাজ করিতেও পারে না!"

কমলা পিতার মতের উপর জোর দিয়া বলিল—"ভাবিয়া যখন লাভ নাই, তখন ত না ভাবাই উচিত; আর আমারও ত মনে হয়, মানুষ কিছু আপন ইচ্ছামত কোন কাজই করিতে পারে না, তবে ভাবাভাবিতে লাভ।"

রমেশ লাফাইয়া উঠিল, এতদিন পরে প্রকৃত একটা সত্যের সন্ধান যেন তাহার তৃষিত মনের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, মানুষ কিছু করিতে পারে না, এই কথাটা যে কত সত্য, কত বড় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এতদিনের মধ্যে এমন করিয়া ত সে একদিনের জন্যও তাহা বুঝিতে পারে নাই। রমেশকে চিন্তিত দেখিয়া কমলা অন্য কথা পাড়িল, বলিল—"আপনার বাবা বুঝি এবার ভাগলপুরে বদলী হইয়াছেন।"

"হাঁ" বলিয়া রমেশ থামিল।

কমলা বলিতে লাগিল—"বাবার কাছে শুনিয়াছি, সে অনেক-কালের কথা, তখন আপনার মা বাঁচিয়াছিলেন, আপনাদের পাশের বাড়ীতেই নাকি আমাদের বাসা ছিল, আমি তখন বালিকা, আমার কিন্তু সে সব কিছুই মনে নাই, আপনার মনে আছে রমেশবাবু।"

রমেশ "না" বলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সে এই মেয়েটির এত বড সহজ আলাপটা যেন হজম করিতে পারিতেছিল না। কমলাও এই নূতন অতিথির ভাবগতিক বড় বুঝিতে পারিল না। কাজেই তাহার আলাপটা জমিতে জমিতে যেন কেমন আদমরা হইয়া গেল। ঝি আসিয়া ডাকিল - "খাবেন আসুন রমেশবাবু।"

[৫]

আহারের পর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া রমেশ দেখিল, সযত্ন-রচিত ধবধবে শয্যার একপাশে ডিবাভরা পান রহিয়াছে। আলনায় তাহার ছাড়া জামা উড়ানী গোছাইয়া রাখা হইয়াছে। গৃহখানা যেন নূতন হাতে বিশেষ করিয়া মার্জ্জিত, ধূলিকণাটি নাই, টিপায়ের উপর আলো জ্বলিতেছিল। সমস্ত আসবাবের মধ্যেই একটা একটানা যত্ন, সমস্ত গৃহেই যেন একখানি সেবাকুশল হস্তের চিহ্ন বর্ত্তমান। রমেশের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। মনে মনে বলিল—"এমন যত্ন ত জীবনে ভোগ করি নাই।" হঠাৎ পুরাণ কথাটা স্মৃতিতে উঠিতেই আর একটি প্রাণীর সেই অপরিসীম যত্নের কথা মনে পড়িল, রমেশের চোখ সজল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে একটা পানের খিলি মুখে পূরিয়া শয্যার উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িল। কমলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোন অসুবিধা ত হইতেছে না।"

নিগূঢ় বিস্ময়ে রমেশের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ; "সুবিধাকে ত আমি তত সুযোগ দিই না যে, আপনাদের পদে পদে অসুবিধার কথায় বিরক্ত করিব।" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার মনের উপর এই অকারণ যত্নপ্রাচুর্য্য যেন দ্বিধা আনিয়া দিল ; ভিতরে যে সংশয় জাগিয়াছিল, বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আপনারা আমার জন্যে অত ব্যস্ত হবেন না ; পর ভাবিয়া যদি কুণ্ঠা বোধ করেন ত আমার যে এখানে তিষ্ঠানই দায় হইবে।" কথাটা বলিয়া রমেশ নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, ইহাদের এত বড় আদরের মূলে তাহার এই "পর" কথাটা যে আরও একটা দাবীই খাড়া করিয়া দিবে ভাবিয়া সে আবারও বলিল—"বলিয়াছি ত, সুবিধা অসুবিধাকে আমি গ্রাহ্যই করি না, দিনটা একভাবে পার করিতে পারাই আমার দরকার।"

আকাশের অন্ধকার কাটিয়া অষ্টমীর চন্দ্র তখন হাসিয়া উঠিয়াছিল, কমলার মুখের উপর সেই জ্যোৎস্নাটা একটা নূতন আভা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। রমেশ তাহার মুখের দিকে একবার দৃষ্টি করিয়াই চকিত সঙ্কোচে মুখ নত করিয়া লইল। কমলাও এতগুলি কথার উত্তরে আর কথাটি বলিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচ সাত দিন রমেশের বিশ্রাম ছিল না, সে তাহার সঙ্গিহীন অবসন্ন প্রাণটিকে আলো আঁধারের বাহিরে রাখিয়া প্রকৃতির নিজ

হাতে গড়া গাছে, পাতায়, ফলে, পুষ্পে ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া সকাল হইতে দুপুর, অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথেঘাটে পর্ব্বতের উপত্যকায় অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুপুরে সে বাসায় আসিত, মোহিনীবাবু অনুযোগ করিতেন, কমলা বারণ করিত; আর যাইবে না বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া পরিপাটি-রূপে আহার করিত; আবার বেলা পড়িয়া আসিলেই, মন বিকল হইত, বিছানায় পড়িয়া থাকিতে বিরক্ত লাগিত, একটু বেড়াইয়া আসিবে মনে করিয়া একবার বাহির হইয়া পড়িলে আর রমেশের সন্ধান পাওয়া যাইত না। কোন দিন সন্ধ্যায়, কোন দিন রাত্রিতে বাসায় ফিরিত। বাসার সম্মুখে আসিয়া কিন্তু প্রতিদিনই তাহাকে বিস্মিত হইতে হইত, আগ্রহপূর্ণ আকুল দৃষ্টি লইয়া কমলা বাহিরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে। এ অপেক্ষা কাহার; এ আগ্রহ কিসের, রমেশ ভাবিতে পারে না। বাড়ীতে পা বাড়াইতেই কমলা লজ্জিত সুন্দর মুখের সলজ্জ হাস্যে বলিয়া উঠিত—"আজও আপনি এত দেরি করিয়া আসিলেন, আমরা দিন দিনই আপনার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইতেছি।"

রমেশের মন নরম হইয়া পড়িত, এ যে বড় বিষম সমস্যা, কঠিন পরীক্ষা, অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে রমেশ দমিয়া যাইত, ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িত। কমলা ছুটিয়া চা আনিয়া দিত,—"চাটুকু খাইয়া শ্রান্তি নাশ করুন, যে পরিশ্রম

আপনি করেন, ইহাতে ত বেশী করিয়া না খাইলে শরীর টিকিবে না।"

রমেশ চা খাইয়া হাসিয়া উত্তর করিত,—"শরীরের জন্য আপনারা মোটেও ভাবিবেন না, ও যেমন আছে তেমনি থাকিবে, বরং বাড়িবে, কমিবে ত না।" বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত।

সে দিন সকালে কমলা আসিয়া বলিল—"রমেশবাবু আজ আর আপনি বাহিরে যাইতে পাইবেন না, বাবা বলিলেন, কটা কথা আপনাকে বলিবার আছে, আজই বলিবেন।"

গাছের উপর দিয়া প্রভাত প্রকৃতির স্নিগ্ধ সুষমা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, রমেশ এক দৃষ্টিতে সেই নবোদিত রবিকরে ঘনায়মান পত্রপল্লবের স্বচ্ছবর্ণ চ্ছটার দিকে তাকাইয়া ছিল। কমলা তাহার পাশে চেয়ারে বসিয়া একটা পড়া মুখস্ত করিতেছে। বাহিরে পবিত্র প্রভাতে বাতান্দোলিত কোকিলমুখরিত নবমুকুলিত আম্রপল্লবগুলি যেন তাহার স্ফীত রক্ত অধরের দিকে তাকাইয়া অসহিষ্ণু বিদ্রূপে হাসিতেছিল। সহসা পিয়ন আসিয়া একখানা খামের চিঠি হাতে দিতেই রমেশ লাফাইয়া উঠিল। চিঠিখানার স্পষ্ট পরিষ্কার অক্ষরগুলির চিরপরিচিত সাগ্রহ আহ্বানের স্বরে তাহার হতাশাপীড়িত হৃদয় যেন আশার অস্পষ্ট পরশে উদ্দামগতিতে নাচিয়া উঠিল। সরযূর হাতের লেখা খামখানা তাহার মনের উপর নব বসন্তের নূতন সজ্জিত পুষ্পসম্ভার লইয়া

পূজার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, মানুষের এমনই একটা সময় আসে, যখন সে বর্ষার বারিসিক্ত মস্তক রাখিতে গিয়া কোনই আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না, তখন আশ্রয়ের অযোগ্য, প্রবেশমাত্রের অধিকার-হীন ধনিগৃহের সৌধশিরের অস্পষ্ট পরিস্ফোটনও মনের মধ্যে ভরসার বিকাশ করিয়া দেয়, আশা তাহাকে কোমল করিয়া তোলে, যাহা হারাইতে বসিয়াছে, যাহা দুর্ল্লভ, দুষ্প্রাপ্য, তাহাই অতি সহজ ও সুলভ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, হৃদয় হৃদয়ের দেবতার জন্য ব্যগ্রতা লইয়া ভাগীরথীর একটানা স্রোতের ন্যায় অবাধ গতিতে বহিয়া চলে, কোথায় নিয়া ঠেকাইবে ইয়ত্তা থাকে না।

খামখানা ছিঁড়িতে গিয়া রমেশের হৃদয় সুপ্তের সুখস্বপ্নের মত দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল, মুখখানা এই পরিদৃশ্যমান প্রভাত-প্রকৃতির মতই সহাস্য, অথচ গম্ভীর, মুহূর্ত্তে সব শেষ হইয়া গেল, আলো নিবিয়া গেল, অন্ধকার জমাট পাকাইয়া চোখের গোড়ায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল, যাহা ছিল, যে একটু আশা, তাহাকে মরিতে মরিতে ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন শূন্যে মিশাইয়া গেল, হতাশার প্রবল আক্রমণে নিপীড়িত রমেশ সজোরে চিঠিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া অবশের মত বসিয়া পড়িল। কমলা চমকিয়া উঠিল, ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কার চিঠী রমেশবাবু।"

বড় একটা বুভুক্ষা, বড় একটা তৃষা লইয়াই রমেশ আপন জীবন কোনমতে দাড় করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন তাহার বুকের

ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল, প্লাবনের মত হৃদয়ের সেই নৈরাশ্য-জড়িত শোণিত-স্রোত চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত মুখ আরক্ত ও উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। হায় পৃথিবীতে যে তাহার জন্য একবিন্দু মমতা বা এক কণা করুণাও নাই। কে যেন তাহাকে তপ্ত পলিপরিপূর্ণ মরুভূমির উপর দিয়া টানিয়া লইতেছে, যে পূর্ণ সুধার ভাণ্ড স্বতঃই তাহার মুখের কাছটিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল, একটা গর্ব্বদর্পিত পদাঘাত তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভিক্ষুকেরও যে আশা, যতটুকু আশ্বাস থাকে, রমেশের আজ আর তাহাও ছিল না, ছিল কেবল শূন্য প্রাণের জ্বলিত বুভুক্ষা, আকাশ বাতাস সবই যেন নাই নাই শব্দে ধ্বনিত, ক্রন্দিত। সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া চিঠিটা কুড়াইয়া আনিয়া রমেশ বলিয়া উঠিল—"আপনার বাবাকে একবার ডাকিয়া দিবেন, একটা বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে।"

কমলা চলিয়া গেল, কলিকাতায় যাইতে হইবে চিন্তা করিতে গিয়াই রমেশ একবার চমকিয়া উঠিল, ভিক্ষুকেরও অধম নিঃসম্বল সে কোন্ আশায় আবার কলিকাতায় যাইবে।

মোহিনীবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন —"বাবা রমেশ, আমায় তুমি ডাকিয়াছিলে।"

"এখুনি আমায় কলিকাতায় যাইতে হইবে।" বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিস্মিত মোহিনীবাবু সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তেমন কোন প্রয়োজন আছে কি, না তোমার বাবা যাইতে লিখিয়াছেন?"

"না" বলিয়া রমেশ মৌন হইয়া রহিল।

"তবে"

মুহূর্ত্ত মৌন চিন্তার পর বুক ও মুখের সমস্ত জড়তা কাটাইয়া এবার রমেশ স্পষ্ট পরিষ্কার স্বরে বলিল—"আমার ভগিনীর বিবাহ. নিমন্ত্রণ-চিঠি পাইয়াছি, না গেলেই হইবে না।" বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় গোছাইতে বসিল। সে যে নীরবে কতবড় স্বার্থটা ত্যাগ করিল, তাহা মোহিনীবাবু বা কমলা কেহই টের পাইলেন না।

[২]

সন্ধ্যার গাড়ীতে রমেশ কলিকাতায় আসিয়া নামিল। হাওড়ার পুলের উপর উঠিয়া তাহার রক্তবর্ণ চোখদুটা যেন জ্বলিতেছিল। উপরে আলোকিত রাজপথ, নীচে গঙ্গার কুলুকুলু নাদ, গতিশীল ষ্টীমারের সঙ্কেত ধ্বনি, মাঝে মাঝে ধূলিধূসরিত দমকা বাতাসের গভীর গর্জ্জন, রমেশের গুরুভারাক্রান্ত মনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল. শান্ত গভীর নিস্তব্ধতার পরপারে যেন বিক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল কল্লোল, নীরব নির্জ্জনতাপ্রয়াসী রমেশের মন এই কোলাহলের মধ্যে উধাও হইয়া গেল। না রহিল সংযম, না ছিল ভাবিবার শক্তি।

কেমন করিয়া কোথায় উপস্থিত হইবে, সে চিন্তা যেন মুহূর্ত্তে তাহাকে ছাড়িয়া গেল। আকাশবাতাস কাণের কাছে শোঁ শোঁ করিতেছিল। মৃত জড়বৎ রমেশ একটা ঠিকা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া কেবলমাত্র বলিল—"হরীতকীবাগান।" তারপর সে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

দোরের গোড়ায় গাড়ী হইতে নামিয়া রমেশের পা সরিতেছিল না। গভীর জড়তা মাখান মন্থর গতিতে এক পা এক পা করিয়া রমেশ দোতলায় উঠিয়াই স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার গতিশক্তিবিহীন পাদুখানার উপর কে যেন চাপিয়া বসিয়াছে, সম্মুখে মুক্তকেশা স্রস্তবসনা সরযূর সেই নীরস ম্লান মুর্ত্তি তাহাকে চেতনাহীন করিয়া দিল—"সরযূ তোমার এই অবস্থা" বলিয়াই সে তাহার সারাদিনের অনাহারক্ষীণ দেহ লইয়া মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টা পরে বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে চোখ মেলিয়া চাহিতে সুশীলার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, শয্যার পাশে সরযূ জড়সড় হইয়া মাতার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছিল। রমেশ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার ফেকাশে পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর শ্রাবণের বর্ষার মত অজস্র ধারা পড়িতে লাগিল। সুশীলা সস্নেহ-স্পর্শে আপ্যায়িত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"বাবা রমেশ, এ ত উতলা হইবার সময় নয়, তোমরা পুরুষ মানুষ, সামান্য আঘাতে

এত ভাঙ্গিয়া পড় ত, আমি যে কোন কাজই করিয়া উঠিতে পারিব না।”

সরযূ কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল, সুশীলা ইঙ্গিতে তাহাকে যাইতে বলিয়া রমেশকে বলিলেন—“এ তোমার কঠিন পরীক্ষার সময় রমেশ, এতে যে তোমায় উত্তীর্ণ হতেই হইবে, তোমার উপরই আমার জাতিমান নির্ভর করিতেছে। অধীর হইয়া আর আমাকে বিপন্ন করিও না বাপ!”

অঙ্কুশাহত অশ্বের মত রমেশ লাফাইয়া উঠিল, সুশীলার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া নির্ভর-পরিপূর্ণ স্বরে বলিল—“না মা, সে ভয় তুমি করিও না, তোমার সন্তান অকৃতজ্ঞ হইবে না, তোমার দুধের স্বাদ যে আজও আমার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে জড়িত রহিয়াছে, সে ত আমায় নিমখহারাম হইতে দিবে না।”

সুশীলা সজল চোখ মুছিয়া ব্যাকুল অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—“আঘাত আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, ওতে আর আমার কিছু করিতে পারিবে না, চিন্তা এখন তোমাদের জন্য। সরযূর কোমল প্রাণ যেন দমিয়া না যায়। মা হইয়া কি দায়ে পড়িয়া যে এমন কাজে হাত দিয়াছি, তাহা ত তোর অগোচর নাই, সেও যে বুকে পাষাণ বাঁধিয়া এই অভাগীর জন্যই মুখ বুজিয়া রহিয়াছে, তাহাও তোমায় নিশ্চিত ভাবেই বলিতে পারি, আশঙ্কা হয়, কি জানি কিসে কি হইবে।”

সুশীলার মুখের উপর কৌতূহলহীন শূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া অনুতপ্তের মত রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"আসিয়া কি অন্যায় করিয়াছি মা?"

সুশীলা উত্তর করিতে পারিলেন না। এ পরীক্ষা যে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পক্ষেই কঠোর। কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি প্রাণের ভালবাসাকে অন্তরিত করিতে পারে! রমেশকে যে তিনি বুকে পীঠে করিয়া সরযূরও অধিক যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। আজ কেমন করিয়া বলিবেন—"সরযূর বিবাহে আসা, সে তোমার উচিত হয় নাই রমেশ?"

উত্তর না পাইয়া এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, সহসা অদ্ভুত রকমের একটা সাহস সঞ্চয় করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না অন্যায় ত কিছু করি নাই, আমার জন্যে তোমার কোন চিন্তাও করিতে হইবে না। সরযূর বিবাহ, সে কি না দেখিয়া থাকিতে পারি। আমি ছাড়া তোমারই বা কে আছে যে, এ সময় সম্মুখে থাকিয়া সাহায্য করিবে।"

রমেশের কথায় বিশ্বাস করিবার মত নিভরতা ছিল। এই বয়স্থ যুবকটার মাথায় চিবুকে হাত দিয়া সুশীলা বলিলেন—"তুমি পারিবে রমেশ, আমার সরযূ মেয়ে হইয়া যে দুধের গুণে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, তোমার পেটেও সেই দুধ আছে। সরযূ তোমার বোন, তাহার বিবাহ, সে ত তোমারই কাজ!"

দুজনেরই চোখ ছাপাইয়া জল পড়িতেছিল। রমেশ মনে মনে বলিল—"সরযূ আত্মরক্ষা করিয়াছে, কি ভুল, মাও সন্তানের

কথাটা এমন করিয়া ভুল বুঝিতে পারে! সরযূ মরিতে বসিয়াছে, আমি তাহাকে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিব, আত্মবলি দিয়া দেবতার কাছে পর জন্মের জন্য অমরবর প্রার্থনা করিয়া লইব।”

ঠিক এই কথাটি ভাবিয়াই রমেশ মধুপুর হইতে বাহির হইয়াছিল, যাহা হইবার নহে, সেজন্য সে আর উতলা হইবে না। সিদ্ধির আশাকে মধ্যপথে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জীবনকে নূতনপথে পরিচালিত করিবে। এ বিবাহ সরযূর প্রাণেও যে কতবড় আঘাত করিবে, তাহা রমেশের অবিদিত ছিল না। সে সরযূকেও রক্ষা করিবে, আত্মত্যাগের মন্ত্র শিখাইয়া দিবে; আর নিজে সে ভগিনীর বিবাহে ভ্রাতার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ইঁহাদের ঋণ যদি আংশিকও শোধ করিতে পারে। নিজের দুর্ব্বলতার জন্য রমেশ লজ্জিত হইল, দুর্ব্বিসহ ভারটা অনায়াসে চাপিয়া রাখিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল—“বলি যদি দিতেই হয় ত, মহাপ্রয়োজনই সাধিত হউক, আমি যেন আত্মবলি দিয়াও সরযূকে উদ্ধার করিতে পারি, মাতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারি।”

রমেশের শয্যার পাশে সরযূ কাঠ হইয়া বসিয়াছিল, মাতার ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিতের মতই সে ঘরে আসিয়া দোর দিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের কালি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, মনের গতি কেমন সংশয়সঙ্কুল জড়তা মাখান রমেশের উপস্থিতি হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়ের

পরে পরে একটা হতাশাযুক্ত দুর্ভাবনা ফুটিয়া উঠিতেছে। দুর্ব্বিসহ চিন্তায় কর্ত্তব্যের কঠোর কষাঘাতে রাত্রিটা যে কোন্-খান দিয়া কিভাবে কাটিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। ভোরের দিকে সরযূ ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের আলো যখন মুক্ত বাতায়নপথে মৃদু মধুর রৌদ্র লইয়া তাহার মুখের উপর পড়িল, তখন দুঃস্বপ্ন জাগ্রত মানুষের মত উঠিয়া বসিল। চোখ রগ্‌ড়াইতে গিয়া মনে হইল, সে অনেক কাঁদিয়াছে, চোখ ফুলিয়া গিয়াছে। হাত তুলিয়া আনিয়া একবার সে প্রভাত প্রকৃতির দিকে তাকাইল, জাগ্রত সত্য যেন মনে বল আনিয়া দিল। যুক্তকরে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিল—"তোমার এই কাজ দেব, এক দিন যে আমি তোমারই নাম করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলাম, নিজে আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, তাহার পরিণাম কি এই। এই যদি তোমার প্রতি নির্ভরতার ফল হয়, আমি তাহাই বরণ করিয়া লইব। তোমার কাজ তুমি বুঝিবে, আমি যেন পাপী না হই, তোমার নির্ম্মল স্পর্শ যেন আমাকে পাপমুক্ত করিয়া দেয়। মায়ের মুখ চাহিয়া আমি অসাধ্য সাধন করিব, পরের ঘরে যাইব। অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি, ক্ষমা করিও।"

বাহির হইতে রমেশ ডাকিল—"সরযূ।"

সমস্ত শরীরের তরল রক্তগুলি গাঢ় হইয়া সরযূর মাথায় জমাট হইল, উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সরযূ দোর খুলিয়া দিল।

রমেশ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একি চেহারা তোমার সরযূ!"

নিষ্ঠুর আঘাতটাকে সরযূ জোর করিয়া সাম্‌লাইয়া লইল। মনে বল আনিতে চেষ্টা করিয়াও সরযূর ম্লান দৃষ্টিতে রমেশ পাগল হইয়া উঠিল। নিজের উজ্জ্বল চোখের সমস্ত দীপ্তিটা সরযূর মুখের উপর নিঃক্ষেপ করিয়া নির্ব্বন্ধের সহিত বলিল —"আত্মহত্যা করিবে সরযূ, প্রাকৃত জনের মত আত্মহত্যায় ত কোন ফল নাই, পুরুষকারও নাই, সাধারণের মত দুঃখের স্পর্শে যদি মাটিতে লুটাইয়া পড় ত তোমার আমার মহত্ত্ব কি। দুর্ব্বলতা দমন কর, আত্মহত্যার পরিবর্ত্তে আত্মত্যাগ কর, জগতে আদর্শ হও।"

একফোটা বিষাদের হাসিতে বিষণ্ণ মুখের ম্লানিমা আরও বাড়িয়া উঠিল, সরযূ কণ্টকিত হইয়া স্থাণুর মত দাড়াইয়া রহিল। রমেশ আবার বলিল—"আমি অতিথি, তোমাকে আজ আমার কথা রাখিতে হইবে, বুভুক্ষিত অতিথির উদরের জ্বালা নিবৃত্ত করিতে হইবে।"

সরযূ কাঁপিয়া উঠিল, একটা অস্ফুট শব্দ তাহার মুখের গোড়ায় আসিয়া আট্‌কাইয়া গেল। রমেশ আবারও বলিল—"মা বলিয়াছেন, এ আমার কঠিন পরীক্ষা, আমি জানি, এ পরীক্ষা আমার একা নহে, তোমার হয়ত আরও বেশী, তাই আমি অনুরোধ করিতে অসিয়াছি, এতে জয়লাভ করিবার জন্য তুমি প্রস্তুত হইবে।

একদিন 'আমায় ভুলিও না' বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আজ আবার সেই মুষ্টিভিক্ষা ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি, তুমি আমাকে ভুলিবে, পরের ঘরে গিয়া যেন রমেশের স্মৃতিও তোমার মনে না আসে। দেবী দেবীই থাকিবে, পৈশাচ স্পর্শ যেন কলুষিত করিতে না পারে, বল পারিবে ?"

ডাক্তার কাটা ঘায়ের মধ্যেই ছুরি চালাইতে আরম্ভ করিল। এই পীড়িত আপনার লোকটির হৃদয়ে অভাবের আত্মত্যাগের যে ভীষণ দাহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অংশ মাথায় পাতিয়া লইবার ভয়ে তাহার নিকট না থাকিয়া কোথায় কোন সঙ্গিহীন নির্জ্জন অরণ্যাণীর নিঃসঙ্গ আবাসে আপনার সিদ্ধির আসন খুঁজিতে যাইবে, তাহা সরযূ বুঝিতে পারিল না। সহসা তাহার মনে হইল, এই পথের পাথেয়গুলি ত ইন্দুমাধববাবু তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া কাড়িয়া লইয়াছেন। তবুও সে তাহার বিহ্বল ভীরুতাকে তাড়াইতে না পারিয়া এই মাসাবধিকাল অন্তর্বাষ্পের অবরুদ্ধ শক্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইলেও চিত্ত স্থির করিতে পারে নাই! হায় আজ সে কি বলিবে? রমেশ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বল সরযূ, তোমার উত্তরের ও'পরই সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বল আত্মহত্যা করিয়া নরকে যাইবে, না, আত্মত্যাগ করিয়া পুণ্যের পবিত্র পথে স্বর্গদ্বার অবলম্বন করিবে ?"

সহসা যেন সরযূ জাগিয়া উঠিল, সমস্ত মোহটা কাটাইয়া দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিজয়ী বীরের মত মুক্তকণ্ঠে বলিল—"তুমি আমার বড় ভাই, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কথায় আমি এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, আমি পারিব।"

"বাচিলাম"—বলিয়া রমেশ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, বাড়াইতে গিয়া মনের সহিত পাও যেন পিছাইয়া পড়িতেছে। সচেষ্ট আত্মদমনের প্রয়াসটা অতিকষ্টে আকড়িয়া ধরিয়া রমেশ বলিয়া উঠিল—"আর একটি প্রার্থনা সরযূ, মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি সংবাদ পাও, তবে ভ্রাতা বলিয়া একবার এই অভাগাকে দেখা দিও।" বলিয়াই সে আর একবারমাত্র সরযূর মুখের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সজোরে বুক চাপিয়া ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সরযূ মাটিতে লোটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"মেয়ে করিয়াই যদি প্রস্তুত করিয়াছ ত, বল দাও ভগবন্।"

[৭]

অগ্ন্যুপাতে সর্ব্বস্বান্ত মানুষ যেমন আহার নিদ্রা ভুলিয়া ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, উৎসাহশূন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয় লইয়া সমস্ত শক্তিতে বাড়ী মেরামতে লাগিয়া যায়, রমেশও ঠিক সেই ভাবেই সরযূর বিবাহের কার্য্যে লাগিয়া গেল। একাজ সেকাজ করিয়া

তাহার যেন আর শ্রান্তি ছিল না, কি করিলে বিধবা সুশীলা কন্যার বিবাহটি নিখুঁত হইয়াছে বলিয়া চিত্তকে সান্ত্বনা করিতে পারিবেন, সে চিন্তাতেই তাহার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন পরে সরযূর বিবাহ, দুপুরে রমেশ আসিয়া সুশীলার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"মা, ফর্দ্দ ত দেখিলাম, কিন্তু এতে ত চলিবে না। বরের একটা ভাল বেনারসি জোড়, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, এদিকে বাড়াইতে হইবে, খাওয়ার দিকেও দু-চার পদ না বাড়াইলে হইবে না।"

"কি করিব বাপ, আমার হাতে যা আছে সে টাকা দিয়াই যে সারিতে হইবে, শক্তিতে বেড় পাইতে ত আমি ত্রুটি করি নাই।"

"টাকার জন্যে তোমার কেন ভাবিতে হইবে, এতই যদি ভাবাভাবির মধ্যে তোমায় রাখিব, তবে আর আমি আসিয়াছি কেন?"

সুশীলা রমেশের মুখের দিকে চাহিলেন, দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি ত উপার্জ্জন কর না রমেশ?"

রমেশ হাসিয়া বলিল—"ঐ তোমার কেমন এক কথা, ছেলে উপার্জ্জন করে না বলিয়া মা নাকি তাহার কাছ হইতে খোরপোষ আদায় করিবে না!"

"না রমেশ, সে আমি পারিব না, তোমার পিতার দান কি করিয়া লইব?"

"আমি যেন তোমাকে বাবার টাকা লইবার জন্য পাইয়া বসিয়াছি, আর তিনিই বা দিতে যাইবেন কেন ?" বলিয়া রমেশ একটা নোটের তাড়া মাটিতে রাখিয়া বলিল—"এ তোমাকে লইতেই হইবে, আমি সরযূর বিবাহে দিব, তুমি কিন্তু এতে না করিতে পারিবে না।"

সুশীলা বিস্মিত দৃষ্টিতে রমেশের মুখের দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, রমেশ বলিল—"এতে তোমার কিন্তু করিবার কিছু নাই, জান ত, মা আমাকে কিছু টাকা দিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কে তাহা বাড়িয়া অনেক হইয়াছে, আজ সেই টাকা হইতেই ইহা তুলিয়া আনিলাম।"

"কত টাকা রমেশ ?"

"হাজার টাকার নোট আছে।" বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাড়াইল ?"

সুশীলা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"দাড়া রমেশ, এত টাকা আমি কি করিব !"

রমেশ সহজ শান্ত স্বরে বলিল—"আমার ইচ্ছা, আমিই সরযূর বিবাহের খরচটা দি, তোমার হাতে যা আছে, এখন তাহা তুমি খরচ করিতে পাইবে না, পরেও ত তোমাকে খাইতে হইবে।"

"না রমেশ, সে আমি পারিব না, তোমার হাতে—"

রমেশ বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"পারিবে

নাত, আমি এই এক কাপড়ে চলিলাম, আর এ বাড়ীতে ঢুকিব না।" বলিয়া সে সত্যই পা বাড়াইল।

সুশীলা হাত ধরিলেন, বলিলেন—"শোন রমেশ ?"

রমেশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"শোনাশুনির মধ্যে আমি নাই, বল বিয়েটা আমায় দেখিতে দিবে কি না, জানত ছোটকাল হইতে এই রমেশকে, তার যেই কথা, সেই কাজ।"

সুশীলা শুষ্ক মুখে কাঁদিয়া ফেলিলেন, রমেশকে নিষেধ করিতে আর তাঁহার সাহসে কুলাইল না। মনে মনে বলিলেন—"করুক ওর যাতে ইচ্ছা যায়, এতেও যদি শান্তিলাভ করিতে পারে।"

ঘণ্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ দেখিল, সুশীলা বরের পিড়ী চিত্র করিতেছেন, সে ডাকিয়া বলিল—"দেখ মা, বাড়ীটাকে ভাল করিয়া সাজাইতে হইবে, তার বন্দোবস্তই আমি করিয়া আসিলাম, আর বরের আংটি—"

"আংটি ত আমি আনাইয়াছি রমেশ ?"

"তোমার যেমন পছন্দ, অমন হাল্কা জিনিষ দিলে মানুষে কি বলিবে, একখানা হীরা বসান না থাকিলে মানাইবেই বা কেন ?" বলিয়া একটা মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় সুশীলার হাতে দিতে গিয়া বলিল—"আর এই ফুল দুটা তুমি সরযূকে দিবে।"

রমেশের এই সাগ্রহ আত্মবিস্মৃত, যত্ন ও বাড়াবাড়িটা সুশীলাকে বিদলিত করিতেছিল, তিনি অন্য প্রসঙ্গ উঠাইতে গিয়া

তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"ছিঃ রমেশ, এ তোমার ভারি অন্যায়, এখনও খাওনি।"

রমেশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"ঐ যা, দেখত আমার কেমন মন, আমি যে খাওয়ার কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আচ্ছা মা, তোমারও কিন্তু অন্যায় কম হয় নাই, এতক্ষণ কি আমায় একথা মনে করিয়া দেওয়া উচিত ছিল না।" তিরস্কারটা এইভাবে ফিরাইয়া দিয়া রমেশ সহসা বলিয়া উঠিল—"আগে খাইয়াই লই, তুমি আজ আমায় ভাত দিবে না, তাই চল, অনেক দিন ত তোমার হাতে খাই না।"

পরদিন সুশীলা রমেশকে খুঁজিয়া না পাইয়া এত ভোরে কোথায় গেল, সে চিন্তাই করিতেছিলেন। সহসা নীচ হইতে রমেশ বলিল—"নাবা রতন, আমি মাকে ডাকিয়া আনি।" বলিয়াই উপরে উঠিয়া আসিল।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত সকালে উঠিয়া কোথায় গিয়াছিলি রে।"

"নীচে আসিয়াই দেখ না।" বলিয়া রমেশ যেমন আসিয়াছিল, তেমনই নামিয়া গেল, সুশীলাও তাহার পিছন পিছন নামিয়া গিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া পড়িলেন। রমেশ বলিল—"রতন, যে খানে যা করিতে হইবে, তাহাত তোকে বলিয়া দিয়াছি, কেমন্ পারবি ত?"

রতন "পারিবে" বলিয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল। বিস্মিত চোখ দুটা রমেশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সকল কি রমেশ!"

"দেখিতেই পাইতেছ, এই পাতাবাহারের গাছগুলি আনিতেই আমি গিয়াছিলাম।"

"সে ত বুঝিলাম, লোকে কি বলিবে বল ত, বিধবার মেয়ের বেতে—"

রমেশ বাধা দিল, বলিল—"ঘরের ভাত পেট ভরিয়া খাইব, তাহাতে যদি কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, সেজন্য আমার মাথা ব্যথাও হইবে না; আর বিধবা বিধবা বলিয়া বারে বারে অমন যা মুখে আসিবে, তুমি যদি তাহাই বলত, আমি কিন্তু সহ্য করিতে পারিব না।"

সুশীলা শান্ত স্বরে বলিলেন,—"যার যা সাজে, তাহাকে ত সেই ভাবেই চলিতে হইবে; অবস্থা বুঝিয়া—"

রমেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবারও সে সুশীলার কথাটা সমাপ্ত হইতে দিল না, উদ্ধত স্বরে বলিল—"আবার ঐ সাজাসাজির কথা, তোমার না হয় কোন কাজ নাই, আমি কিন্তু কাজ ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ঐ বাজে কথাগুলি শুনিতে পারি না। অবস্থা,—কেন, দুরবস্থার মতইবা আমরা কি করিতেছি।"

সুশীলা মৌন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, রমেশ তাহার হৃদয়ের

প্রচ্ছন্ন গুরু যাতনাটা যে কিভাবে কিসের মধ্যে ঢাকা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, ভাবিতে গিয়া তাঁহার চোখ কাণায় কাণায় ভরিয়া আসিল। রমেশ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আকুল হইয়া বলিল—"ঐ দেখ, তুমি মুখ ভার করিয়া রহিলে। ও কি, কাঁদিতেছ বুঝি। নারে রতন, কাজ নাই ওছে, তুই যা ত, এগুলো শিগ্‌গীর করিয়া বাড়ীর বাহিরে দূর করিয়া ফেলিয়া দে।"

রতন থম্‌কাইয়া গেল, ইহাতে যে তাহারও উৎসাহ কম ছিল, তাহা নহে, বিশেষ করিয়া এত ক্লেশে ঘাড়ের বোঝা বাড়ীতে আনিয়া আবার ফেলিতে যাইবে, রতনের কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"যা না রতন, দাঁড়াইয়া রহিলি যে।"

সুশীলা নিষেধ করিয়া বলিলেন—"আনিয়াছ ত আর ফেলিয়া কাজ নাই, রতন তোর রমেশবাবু যেমনটি বলে, ঠিক তেমনটি করিয়া সাজাইয়া দে।" বলিয়াই তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

[৮]

দুদিন রমেশ কাজের ভিড়ে সরযূর নিকট হইতে পাশ কাটাইয়াই চলিয়াছে, তবু তাহার উৎকণ্ঠিত অশান্ত মন একবার সেই মুখখানা দেখিবার জন্য যেন বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। বাড়ীভরা

লোক, দেখা করিবার বা কথা বলিবার মত সুযোগ বা সুবিধা ছিল না, তবু এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও রমেশ আর্ত্তের মত এক একবার ঐ ঘরখানার দিকে কাণ খাড়া করিতেছিল, সহসা সন্ধ্যার বোঝা মাথায় লইয়া রাত্রি নামিয়া আসিল, বাহিরে রোসনচৌকী মিহিসুরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল, রমেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, রতন কথামত আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়াছে। সে একবার চোখ বুজিল, কি ভাবিয়া খানিকক্ষণ কাঠের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা ছুতা করিয়া সরযূর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সরযূ শ্রান্ত দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া পায়ের নখ খুটিতেছিল। রমেশকে দেখিয়া নিজের অজ্ঞাতে একবারের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। বিকৃত স্বরে রমেশ ডাকিল—"সরযূ?"

সরযূ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ গম্ভীর, আত্মত্যাগের জলন্ত জয়যুক্ত, তাহাতে আনন্দের চিহ্ন ছিল না, বেদনার আভাসও ছিল না, শান্তির আশাহীন, অথচ অশান্তির উদ্বেগশূন্য, কারুণ্যহীন, গম্ভীর যেন নিস্তরঙ্গ বারিধিবক্ষ, পৃথিবীর বাহিরে সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা, রমেশ দেখিয়া আত্মসংযম করিয়া উঠিতে পারিল না, ডাকিল—"সর!"

সরযূর সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, সংযত চিত্তকে দৃঢ়রূপে আকড়িয়া ধরিয়া উত্তর করিল—"এ সময় একি দুর্ব্বলতা, তুমি ত পুরুষ রমেশদাদা, এস ভাই, আজ এই শুভ দিনে আমায় মাথায়

হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন জয়ী হইতে পারি, পবিত্র হিন্দুরমণীর আদর্শ হইতে যেন আমাকে পড়িয়া যাইতে না হয়, তুমি সাহস দাও।" বলিয়া সরযূ মধ্য পথেই থামিয়া গেল, রমেশের বিকৃত পাংশু মুখ দেখিয়া তাহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

রমেশ স্তম্ভিত, দাঁতে দাঁতে কামড়াইয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে সরযূর দিকে তাকাইয়াছিল, সরযূ আত্মসংযম করিয়া বলিল— "তুমিই ত আমায় এপথে আসিতে অনুরোধ করিয়াছ, তবে আজ আর এ বিস্মৃতি কেন? তোমার মুখ হইতে যদি সে দিন সে উপদেশ না শুনিতাম, তবে—"

রমেশ অসংযত স্বরে অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে ধরিল। বলিল—"আমারই দোষ।"

"এ কি কথা রমেশদা, দোষ গুণ ত আমি জানি না, আজ আর সে বিচারের ইচ্ছাও আমার নাই, বোধ করি সে অধিকারও নাই। একপা একপা করিয়া যে পথে আমি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, আরত সে পথ ত্যাগ করিতে পারি না, যে চিরপরিচিত পথের দিকে একদিন আমার মন ঝুকিয়া পড়িয়াছিল, সে পথত কাঁটার বেড়ায় তোমরাই চিররুদ্ধ করিয়া দিয়াছ। এখন যে এই পথই আমার পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, আমিত শেষ পর্য্যন্ত চলিব বলিয়া এই দীর্ঘ পথকেই সহজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, এতে ক্লেশ করিবার অধিকারও যে আমার আর নাই, এস ভাই, মাথায় হাত রাখিয়া

ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিয়া দাও, সতী রমণীর গর্ব্বে আমি যেন আমাকে পুণ্যবতী করিতে পারি।"

রমেশের হৃদয় রুদ্ধ বেদনাপূর্ণ ক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—"তাইত এ আমি কি করিতেছি, বালকের ন্যায় সাপ লইয়া খেলার জন্য ছুটিয়া যাওয়া কি আমার উচিত, এযে দীপ্ত অগ্নি, স্পর্শ করিলে ভস্ম হইতে হইবে। না না, আমাকে ত প্রকৃতিস্থ না হইলেই নহে।" সরযূকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ভুল সরযূ, আমারই ভুল, আমি ভাই, তুমি বোন। অদ্যকার দুর্ব্বলতা তুমি ক্ষমা করিও সরযূ, সত্যই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সতীকুলের আদর্শ হইয়া এই ভ্রাতৃ-হৃদয়কে গৌরবান্বিত করিবে।" বলিয়া নত দৃষ্টিতে ধীর পাদবিক্ষেপে রমেশ বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।"

বরপক্ষের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে রাত্রি তিনটার লগ্নে যখন বিবাহ হইতেছিল, তখন রোসনচৌকীর কড়া আওয়াজটা যেন রমেশের কাছে ঢিলা বেসুরা লাগিতে লাগিল। এই সময়টির জন্যই বিশেষ করিয়া প্রজ্বলিত গ্যাসগুলি উৎসবশেষের দীপ্তিহীন দীপের ন্যায় কেমন নিষ্প্রভ, সমস্ত পৃথিবীতে যেন বাতাসের নাম গন্ধ ছিল না, রমেশের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সহসা রমণীগণের মুখে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল, রমেশ বুক চাপিয়া

বসিয়া পড়িল, গায়ের তরল রক্তগুলি জমাট পাকাইয়া বরফ হইয়া গেল।

বিবাহ-বাড়ীতে রমেশের জন্য চিন্তা করে সুশীলা ভিন্ন এমন দ্বিতীয় ছিল না, সুশীলার মন থাকিয়া থাকিয়াই তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিল। রমেশকে তিনি যত জানিতেন, এত ত আর কেহ জানে না, জানিয়া শুনিয়া কি আঘাতটা হৃদয়ে লইয়া সে নীরবে আর একটিমাত্র কথা না বলিয়া এই কঠোর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়াই সুশীলার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা রমেশের উপর পড়িয়া ছিল, এবার তিনি বিবাহের বর-কন্যা ফেলিয়া আসিয়া রমেশের হাত ধরিলেন। বলিলেন—"রমেশ বাবা, এ সময়ে যেন আমার চক্ষে জল আসিতে দিও না।"

রমেশ অবশের মত অবসন্ন স্বরে ডাকিল—"মা।"

জল আপনা হইতে বাহির হইয়া আসিল, সময় অসময় শুভাশুভের জন্য সে চিন্তা করিল না! দমকাবাতাস সুশীলার হৃদয়টা নাড়িয়া দিল। তিনি চোখ মুছিলেন, বলিলেন—"সরযূ যে তোমার বড় আদরের রমেশ, তার ত বাপ অমঙ্গল হইবে।"

তড়িদ্বেগে রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"যাও মা, আমার মোহ ঘুচিয়াছে, আর ভাবিতে হইবে না। তুমি সরযূকে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মঙ্গলস্পর্শই তাহাকে সুখী করিবে।"

সুশীলা চলিয়া গেলেন, বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কিন্তু তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে ধান্যদূর্ব্বা পড়িয়া গেল।

বিবাহের পর রমেশ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বাসরঘরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। বরের পার্শ্বে নববধূবেশে লজ্জাজড়িত সজ্জিত সরযূর মুখের দিকে তাকাইল, ঠিক সে সময়ে সরযূও একবার চোখ চাহিয়াছিল। রমেশের উন্মত্ত মন যেন সে দৃষ্টির মধ্যে একটা সকরুণ মিনতি দেখিতে পাইল, সে আর দাড়াইল না, একটা দীর্ঘ শ্বাসও ত্যাগ করিল না, বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে আলোকিত রাজপথে আসিয়া পড়িল, তারপর ধীর গতিতে কতটা যে অগ্রসর হইয়াছিল, সে অনুভূতি তাহার ছিল না, সম্মুখে একটা প্রশস্ত রোয়াক দেখিয়া তাহার উপর বসিতে গিয়া সহসা টলিয়া পড়িল।

রাত্রির শেষ মুহূর্ত্তে পাশের বাড়ীতে পুরাদমে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সে শব্দে রমেশ দুইহাতে চোখ রগ্‌ড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, পূর্ব্বাকাশে নব-অরুণরাগ দেখা দিয়াছে, রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া প্রভাতের আলো ধীরে ধীরে পৃথিবীবক্ষে পাদক্ষেপ করিতেছিল, ক্লান্তিহীন প্রভাতবায়ু শিশুর মত মন্দ গতিতে বহিতেছিল, রমেশের অবসাদ অনেকটা কাটিয়া গেল, ঋণমুক্তের মত আপনাকে অনেকটা হাল্কা মনে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘুমের ঘোরে চোখ বুজিয়া আসিতেছিল, পা বাড়াইতে গিয়া দেখিল, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা-জর্জ্জরিত,

এই কয়দিনের শ্রান্তি তাহার দেহকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে। অতিকষ্টে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া গঙ্গার পথ ধরিয়া প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সে একটা সাড়াশব্দহীন স্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চিত্ত তখন চিরপ্রার্থিত আশার সফলতা-ভঙ্গে জগতের বাহিরে জনপ্রাণিহীন এই প্রকারের একটা আশ্রয়ই খুজিতেছিল। অযথা, প্রতিকারে অক্ষম মানুষের সহানুভূতি যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

গঙ্গার পাড়ের দীর্ঘ চওড়া বাড়ীগুলি রমেশের মাথার উপর পতিত নবোদিত সূর্য্যের রশ্মি ঢাকিয়া দিল। কত দীর্ঘ দিনের গড়া আশা, লোহার মত কঠিন, পাথরের মত শক্ত, যাহা জীবনেও ভাঙ্গিবে বলিয়া রমেশ ভাবিতেও পারে নাই, দুরদৃষ্ট সহসা সে আশাটাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া রমেশকে জীবনের জন্য পথের কাঙ্গাল করিয়া তুলিল। আজ সে তাহার এই ব্যর্থ জীবন লইয়া বিগত সুখশান্তির কথা ভুলিয়া কি করিবে, কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহার এই তিক্ত জীবনের দুঃস্বাদ যে স্পৃষ্ট জিনিষকেই তিক্ত নিরস করিয়া দিবে। যে গৃহে রমেশ প্রবেশ করিবে, সে গৃহই যে অশান্তিময় হইয়া পড়িবে, এ যে দুষ্ট গ্রহ, ধূমকেতুর মতই ইহার দর্শন। যে দুর্ভাগ্য তাহার বহু ঈপ্সিত পূর্ণপ্রায় আশাকে চিরদিনের মত নির্জ্জীব করিয়া দিল, পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে বর্দ্ধিত আশার গোড়াকে একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিল, সে যে তাহাকে কাহারও আশ্রয়েই তিষ্ঠিতে দিবে না।

[৯]

"ক'দিনে আপনার শরীর এত শুকাইয়া গিয়াছে রমেশবাবু, যেন চিনিতে পারা যায় না, ভগিনীর বিবাহে খুব খাটিতে হইয়াছে বুঝি!"

কমলার কথার উত্তরে রমেশ একটিমাত্র "হু" বলিয়া থামিল।

কমলা আবার বলিল—"সময়ে স্নান আহারও ত হয় নাই, আজ এখুনি স্নান করিয়া নিন, সকাল সকাল খাইয়া বিশ্রাম করিলে শরীর সুস্থ হইবে।"

নিরুপায়ে পড়িয়া রমেশ আসিয়া মধুপুরেই উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উপদ্রুত মনের উপর কমলার এই শুভ কামনাপূর্ণ স্নেহ-প্রবণতাটা যেন অভিশাপের মত বাজিতে লাগিল। যে স্নেহ, যে নিবীড় বন্ধন ছিন্ন করিয়া আজ সে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে পৃথিবীর কাছে বিদায় চাহিতেছে, মুষ্টিভিক্ষার মত তাহার প্রতি এ করুণার দান কি বিধাতার উপহাস নহে, এ যে অযাচিত ভিক্ষায় পিপাসার তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া তাহার ছট্‌ফটানিটা প্রত্যক্ষ করিবার বিপুল উদ্যম, সে ত ইহা চাহে না, তাহার মন যে নৈরাশ্যের দিকেই ধাইয়া চলিয়াছে, পৃথিবীতে কতটা দুঃখ আছে, তাহাই সে দেখিবে, একবার পরীক্ষা করিয়া লইবে, প্রবল দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতেও তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়া, মন দেহ ছাড়িয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করে কি না? রমেশ কথা বলিল না। কমলা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ঐ দেখুন, আপনি কেমন উঠিতেছেন

না, বাবা যে আমায় মন্দ বলিবেন, তিনি আপনার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।"

রমেশ চমকিয়া উঠিল, তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কেন? রমেশ তাহার কে? রুক্ষ স্বরে বলিয়া বসিল—"আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, আমি ঠিক সময়ে স্নান করিব।"

"ঠিক সময়ে স্নান করিবেন, এখনও কি স্নানের সময় হয় নাই রমেশবাবু, বেলা যে পড়িয়া আসিল।"

রমেশ অধীর হইয়া উঠিল, কমলার এই সেবাপরায়ণ স্নেহপ্রবণ মনের বেগটা সে তাহার নীরস শুষ্কপ্রায় হৃদয়ে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া খানিকক্ষণ কুণ্ঠিতভাবেই বসিয়া রহিল, তারপর শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"স্নানের সময় যে হয় নাই, সে কথাত বলিতেছি না, ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই, সেই কথাই বলিতেছিলাম।"

"বেশ ত, ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই, আপনার চোখ শুষ্ক বসিয়া গিয়াছে, গলার হাড় জাগিয়া উঠিয়াছে, এখনও নিয়মমত স্নানাহার না করিলে যে আরও কাতর হইয়া পড়িবেন।"

"আহার কি আমাকে সেই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে। এ-রোগ যে ঔষধেও সারে না।" অস্ফুটস্বরে কথা কয়টা বলিয়া রমেশ চমকিয়া উঠিল।

কমলার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে ভীতস্বরে বলিল—"তাই বলুন, আপনার কোন অসুখই করিয়াছে, এই না বাবাকে

নিষেধ করিতেছিলেন, আচ্ছা আপনি স্নান করিয়া আসুন, আমি বাবাকে গিয়া ডাক্তার ডাকিতে বলি।" বলিয়া কমলা দুই পা বাড়াইল।

রমেশ বাধা দিয়া বলিল—"না না, করেন কি, অসুখ ত আমার কিছুই করে নাই, বৃথা কেন ডাকাডাকি হাকাহাকি করিতে যাইবেন।" বলিয়া সে তেলের বাটী টানিয়া লইল।

কমলা স্তম্ভিত হইয়া গেল, এই লোকটির কিসে যে সন্তুষ্টি, কিসে যে সুখ ও স্বাস্থ্য, তাহাত সে বুঝিতেই পারে না, জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারিতেছিল না। অথচ কেন যে তাহার স্ত্রীহৃদয় প্রথম দর্শন হইতেই ইহার জন্য অজ্ঞাত সমবেদনায় কাতর হইতেছিল, তাহাও সে জানে না! বিস্ময়ের বিষয়—ইহার এই ঔদাস্য তাহাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে, পায়ের কাঁটা খুলিয়া দিবার জন্য তাহার অনভিজ্ঞ সরল প্রাণ ব্যাকুল হয়। কিন্তু উপায় ত নাই, তাহারা যতই ঘনিষ্ঠ হইতে চাহে, রমেশ যে ততই নিজেকে গোপন দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিতেছে। এবারে সে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"তাই যান, স্নান করিয়া আসুন, আমি আপনার আহ্নিকের যায়গা করিয়া রাখিতেছি।"

ক্ষুণ্ণ স্বরটা রমেশের উদ্বিগ্ন মনের এক কোণে যেন একটু ক্ষুদ্র স্পর্শ করিল, কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল, এই উপেক্ষাটা সেবাকুশল স্নেহময় এই পরিবারটিকে নিরুপায় করিয়া তুলিতেছে;

সে ইহাদের উপদ্রব হইয়া পড়িতেছে। তেল মাখিতে মাখিতে রমেশ ঊর্দ্ধনেত্রে এই চিন্তাই করিতেছিল, কমলা কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"আপনি ভগিনীর বিবাহে গিয়াছিলেন রমেশবাবু, বাবা কিন্তু শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কোন ভগিনী কলিকাতায় আছেন, তাহা ত তিনি জানেন না।"

যেখানটায় ব্যথা সেখানটায়ই আঘাত, তবু রমেশ এবার যত্ন-সুলভ স্থিরকণ্ঠে বলিল—"তিনি হয়ত তাকে জানেন না, মা মারা গেলে পাশের বাড়ীর যিনি আমাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহারই কন্যা।" বলিয়াই রমেশ থামিয়া গেল, ক্ষুব্ধ কণ্ঠের নিরুদ্ধ আবেগটা যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহার মনকে উদ্বেগচঞ্চল করিয়া তুলিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার ভগিনীর নামটি।"

রমেশ সঙ্ক্ষেপে উত্তর করিল—"সরযূ।"

রমেশের স্বর কাঁপিয়া উঠিল, কমলা বলিল—"বা বেশ নামটি ত, কোথায় বিবাহ হইল তার?" বলিয়াই চাহিয়া দেখিল, রমেশের মুখ চোখ একেবারে সাদা হইয়া উঠিয়াছে, একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই, মূর্চ্ছিতের মত স্থিরনেত্রে চাহিয়া রমেশ যেন উপরের কড়িকাঠগুলি গণিতেছিল। কমলা ব্যস্ত হইল, সহসা সে আর্ত্তস্বরে ডাকিল—"রমেশবাবু!"

রমেশের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। কমলা তাড়াতাড়ি বলিল—"দেখুন দেখি, আমার কি অন্যায়, কোথায় আপনাকে

স্নানের জন্য তাড়া দিব, তা না করিয়া বাজে কথায় সময় নষ্ট করিতেছ।”

সন্ধ্যার পরে চিম্‌নির মধ্যস্থ আলোটা কমাইয়া দিয়া রমেশ চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। মোহিনীবাবু আসিয়া ডাকিলেন—“রমেশ জাগিয়া আছ বাবা!”

উঠিয়া বসিয়া রমেশ কলটা টিপিয়া দিতেই দীপের আলোতে সমস্ত ঘরখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মোহিনীবাবু তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিয়া বলিলেন—“তোমার বাবা এ চিঠি লিখিয়াছেন, পড়িয়া দেখ, আমিও একথা বলিব বলিয়াই সেদিন তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তুমি হঠাৎ চলিয়া গেলে।”

একসঙ্গে দুই দুইটা স্মৃতি রমেশের মনে জাগিয়া উঠিল, পিতার অযথা নিষ্ঠুর আচরণ, সরযূর নিকট হইতে চিরবিদায়। রমেশ ব্যাকুল নেত্র তুলিয়া মোহিনীবাবুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল—“অন্যায় করিয়াছি কি, দেখুন দেখি, আমার কেমন মন, আপনার কথটা যে শুনিতে হইবে, সেদিন তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।”

চড়াপথে ষ্টীমার ঠেকিবার ভয়ে মাঝি যেমন জল মাপিয়া চলে, এই রমেশের প্রাণের টানটাও মোহিনীবাবু সেই ভাবেই মাপিয়া চলিতেছিলেন। বলিলেন—“না বাবা, অন্যায়ত এমন কিছু হয় নাই। তোমার পিতার চিঠিখানা পড়িয়া আমায় মত জানাইলেই হইবে।”

চিঠীর উপর চোখ দিতেই রমেশের কণ্টকিত হস্ত হইতে তাহা পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া চিঠীখানা উঠাইয়া এক শ্বাসে সমস্তটা পড়িয়া ফেলিল। মোহিনীবাবু রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া এই যুবকটির চাঞ্চল্যই পরীক্ষা করিতেছিলেন। সহসা মুখ উঠাইয়া রমেশ কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। মোহিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ প্রস্তাবে তোমার বোধ হয় অনভিপ্রায় হইবে না রমেশ ?"

চিঠীখানা চৌকীর উপর রাখিয়া দিয়া রমেশ স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিল—"বাবাত পাঁচ সাত বছরের মধ্যে আমার বিবাহ দিবেন না বলিয়াছিলেন।"

"ওটা ফাকা কথা।"—বলিয়া মোহিনীবাবু একটু হাসিয়া, বলিলেন—"জান ত সরযূর সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়, এ ইচ্ছাই তাঁহার ছিল না।"

রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল, বলিল—"পিতার কথা ফাকাই হউক, আর যথার্থই হউক, সে বিচার পুত্রের কর্ত্তব্য নহে, আমি তাঁহার আজ্ঞাই পালন করিব, শীঘ্র বিবাহ করিতে পারিব না।"

"এও তোমার পিতার আজ্ঞা রমেশ ?" বলিয়া মোহিনীবাবু রমেশের গায়ে নিজের স্নেহকোমল হাতখানা রাখিলেন।

রমেশ মুহূর্ত্ত নীরব রহিল, তাহার পিপাসাক্ষাম কণ্ঠের অতি সান্নিধ্য হইতে সুপেয় সুবাসিত জলের পাত্রটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া

এ যে ঘোল দিয়া পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা, একি বিদ্রূপ, না আর কিছু। মোহিনীবাবু বলিলেন—"কমলা ত তোমার অযোগ্য হইবে না বাপ?"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, অতিকষ্টে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করিয়া বাক্ সংযম করিল, বলিল—"যোগ্যাযোগ্য বিচার ত আমি এখন করিতে পারি না। আপনি আমার পিতার বন্ধু, পূজনীয়, আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া আর এর জন্য—"

অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে ধরিয়া মোহিনীবাবু বলিলেন—"সে দাবীতেই আজ আমি তোমায় জোর করিয়া বলিতেছি, কন্যাদায় হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

রমেশ বসিয়া পড়িল, হাত জোড় করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমায় ক্ষমা করুন, ভাবিবার সময় দিন।" বলিয়াই সে শুইয়া পড়িয়া কষ্টরুদ্ধ অশ্রুর দ্রুত আঘাতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

[১০]

পরদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই রমেশের গাটা কেমন ছমছম করিতেছিল, এতদিনের খাটুনি, দুর্ব্বিসহ চিন্তা, তাহার সুখী শরীরকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। কমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"ও আপনার বুঝি এখনও হাত মুখ ধোয়া হয় নাই, আমি যে চা আনিয়াছি।"

রমেশ পাশ ফিরিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া বলিল—"আজ আর চা খাইব না, শরীরটা বড় ভাল নাই, বোধ হয় জ্বর হইয়াছে।"

কমলা শঙ্কিত হইল, তাড়াতাড়ি বলিল—"জ্বর হইয়াছে, কৈ বাবাকে ত কিছু বলেন নাই, অসুখ করিলে কি তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হয়।"

রমেশ এই সুন্দরী মেয়েটির নির্লজ্জতায় মনে মনে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, ইহার এই কুসুম-সুকুমার মুখের কোণায় যদি একটু লজ্জার রেখা টানা থাকিত, তবে কতই না মনোরম হইত? বলিল—"এ আর কি বলিতে যাইব, ব্যস্ত হইবার মত ত নহে।"

কমলা সঙ্কুচিত হাত বাড়াইয়া রমেশের কপাল স্পর্শ করিল। আগুনের মত স্পর্শে তাহার মুখ চিন্তাম্লান হইয়া উঠিল। শঙ্কিত স্বরে বলিল—"যাই বাবাকে বলি গিয়া।"

কমলার এই স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতাটা আজ যেন রমেশের নিকট কেমন স্বার্থময় মনে হইতেছিল। তবু তাহার স্পর্শে রমেশ একবারের জন্য শিহরিয়া উঠিল। গম্ভীর হইয়া বলিল—"না না আপনার বাবাকে বলিবার কোনও আবশ্যক নাই, আপনিও ব্যস্ত হইবেন না, এ সাধারণ জ্বর, দুদিনে সারিয়া যাইবে।"

কমলা সে কথায় কাণ দিল না, সংবাদ দিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মধুময় প্রভাতের সেই আলোকিত গৃহে রমেশ

কমলার নির্লজ্জতা ও নানা প্রকারে আকর্ষণের চেষ্টার কথা মনে করিয়া মরমে মরিয়া রহিল।

তিন দিন রমেশের হুঁস ছিল না, চতুর্থ দিন রাত্রিতে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রমেশ কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কোথায় ?"

কমলা ধীরে ধীরে মাথায় বাতাস করিতেছিল, পাখা রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"আপনি আমাদের এখানেই আছেন, কেন কোন কষ্ট হইতেছে কি ?"

"আপনি কেন আমার জন্য এত করিতেছেন ?" বলিয়া রমেশ চাপা শ্বাস ত্যাগ করিল।

এই কেনর উত্তর কমলা জানিত না, তাহার স্বভাব-কোমল পরদুঃখকাতর মন কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই যেন তাহাকে স্বকার্য্যে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল। রমেশ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"আমার বাবাকে সংবাদ দিয়া আপনারা শ্বস্তি লাভ করুন, বৃথা ঋণ বাড়াইবেন না।"

কমলা উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—"ও কি কথা রমেশবাবু ?"

রমেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ইহার পূর্ব্বে আরও একবার জ্বর হইলে, সুশীলা ও সরযূর ঠিক এই ভাবের প্রাণপাত পরিশ্রম ও যত্নের কথা তাহার মনে পড়িল, সে যে ঘোর অকৃতজ্ঞ, তাহার অকৃতজ্ঞতা হইতে ত ইহাদিগকেও সে বাদ দিতে পারিবে না,

বলিল—“এ যে কাঁটা বনে মুক্তা ছড়ান হইতেছে, আমি পাপিষ্ঠ আপনাদের এ যত্ন চেষ্টার ঋণত আমি জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না।”

কমলা ভাবিয়া ইহার উত্তর পাইল না, রমেশ বলিল—“নযত আমাকে বাবার কাছেই পাঠাইয়া দিন।”

ধীরে কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কমলা জবাব দিল —“সে যাহা হয় বাবা করিবেন, আমি তাঁহাকে আপনার সমস্ত কথাই বলিব।” বলিয়া সে নীরবে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

দিন তিনেক পরে রমেশের পিতা যে দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সে দিন রমেশ ভাত খাইয়া বেশ একটু সুস্থ হইয়াছিল। ইন্দুমাধববাবু বলিলেন—“বাবা রমেশ, মোহিনীর মেয়েটিকে তোমার উদ্ধার করিতে হইবে, তোমার জন্যে কমলা কত করিয়াছে, তাহাত দেখিয়াছ, সৌন্দর্য্যেও তোমার অযোগ্য হইবে না, তুমি ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।”

কমলা ঘরের এক পাশে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে কি কাজ করিতেছিল, বিবাহের প্রস্তাবে সে এতটুকু হইয়া মুখ নীচু করিয়া দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল। রমেশ মনে মনে ভাবিল, পিতা বেশ জাল পাতিয়াছেন, চক্রান্ত করিয়া ইহারই জন্য তিনি তাহাকে এখানে পাঠাইয়া ছিলেন। সহসা তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক উত্তেজিত

হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় অথচ উদ্ধত স্বরে উত্তর করিল—"বাবা, তুমি না শিগ্‌গির আমার বিবাহ দিবে না বলিয়াছিলে।"

"সে তখন বলিয়াছিলাম, বন্ধুর অনুরোধ, এখনত অন্য কথা না বলিয়া পারিতেছি না।"

"আমি তোমার আজ্ঞাই পালন করিব, পিতার বন্ধু অপেক্ষা পিতা যে আমাদের অনেক বড়, তাহা আমি ভুলিব না, এখন আমি বিবাহ করিতে পারিব না।" বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

রমেশ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল, কথাটা যখন পাঁচ কাণ হইল, তখন তাহার আর এখানে থাকা পোষাইয়া উঠিল না, কমলাও যেন আগেকার মত আর তাহার দিক্ দিয়া ঘেঁষিত না, এই নিরপরাধা বালিকাটির জন্য রমেশের প্রত্যুপকারদুর্ব্বল হৃদয় হইতে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া আসিত, এক দিন সে একেবারে সাজিয়া গুজিয়া মোহিনীবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আমার আর এখানে থাকা হইতেছে না, আমি চলিলাম।"

"কোথায় যাইতেছ রমেশ!"

"আপাতত কলিকাতায় যাইব।" বলিয়া রমেশ উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল পথের ধারে দাঁড়াইয়া কমলা নতবদনে কি ভাবিতেছে। সহসা

সে বলিয়া উঠিল—"আপনারা আমাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়িবেন না জানি, তবু যাইবার কালে বলিয়া যাইতেছি, সাধ্য থাকিলে আমি ইহাতে অমত করিতাম না, সাধ করিয়া ত কেহ হাতের রত্ন ফেলিয়া দেয় না, আমি নিরুপায়, আমায় ক্ষমা করিবেন।"

উল্টা দিক্ দিয়া কমলা আজ বিশ্বস্ত সুহৃদের মত এই লোকটিকে নির্ম্মম বলিয়া ঠিক না করিয়া পারিল না। জবাব দিবার শক্তি তাহার ছিল না, সে এত বালিকা নহে যে, এ সকল কথা বুঝিতে পারে না। এ উপেক্ষাটা যে অপমানের চরম সীমায় উপস্থিত করিয়াছে, তাহাও সে বুঝিতেছিল, তবু কিন্তু রমেশের উপর সে সম্পূর্ণ বিরূপ হইতে পারিল না। রমেশ বলিল—"এই যে যাইতেছি, হয়ত আর আপনাদের সহিত দেখা হইবে না। আর না হউক, দুর্ব্ব্যবহারের কথা মনে করিয়াও আপনারা আমাকে মাঝে মাঝে মনে করিবেন বলিয়া ভরসা রহিল।" বলিয়াই সে এক পা এক পা করিয়া অদৃশ্য হইল। দুদিনের পরিচিত বন্ধুটির জন্য কমলার বক্ষঃ হইতেও নিঃশব্দে একটি সমবেদনা-পূর্ণ শ্বাস বাহির হইয়া গেল।

[১১]

কলিকাতায় আসিয়া রমেশ ছাত্রাবাসের একান্ত নিভৃত একটি প্রকোষ্ঠ আশ্রয় করিল। দিনের আলোর মুখ দেখিতে সে ভয়

পাইত, রাত্রির জ্যোৎস্নাও সহ্য করিতে পারিত না। বিচ্ছেদ-ভীরু মন লইয়া আবর্জ্জনার মত সংসারের সমস্ত বন্ধন জোর করিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য পড়াও ছাড়িয়া দিল। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকিতেছিল।

রমেশের নিভৃত চিন্তায় বাধা জন্মাইত যোগেশ। কঠোর উপেক্ষাকে বরণ করিয়া লইয়া এই বাল্য বন্ধুটি আসিয়া যখন-তখন উপদ্রব করিত, যে কথায় সে কথায় অত্যাচার করিয়া রমেশের চঞ্চল মন সবিকার করিয়া তুলিত। হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিত—"মানুষকে ফাঁকি দেওয়া তত শক্ত নয় রমেশদা, যত শক্ত মনকে ফাঁকি দেওয়া।"

রমেশ সকৌতূহল দৃষ্টি তুলিয়া এই চির পরিচিত, অদ্ভুত প্রকৃতি বন্ধুটীর দিকে তাকাইয়া থাকিত, আপন মনে বলিত—"তাইত, এত করিয়াও ত কৈ মনকে বোঝাইতে পারিলাম না, এ যে মুখে মুখোস আঁটিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টাই হইতেছে!"

গোপন স্থানের আঘাতের দাগটা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য রমেশত চেষ্টা বা যত্নের ক্রটি করিতেছে না, তবু কেমন সে দাগটা নিকষে কাটা সোণার দাগের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। কঠোর হইয়া সংসারের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষার জন্য যতই বুক বাঁধিতেছিল, সংসার যেন ততই নির্ম্মমতার উপহাস লইয়া দুই বাহুতে সজোরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে। সরযূকে

ভুলিবার চেষ্টা যতই প্রবল হইতেছিল, ততই যেন সরযূর চিন্তা তাঁহার স্মৃতিটাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রেতের মত জাগ্রত থাকিয়া নিরন্তর উপদ্রবে রমেশের সংযম-কঠোর প্রতিজ্ঞাকে শিথিল করিয়া দিতেছিল।

ঠিক এই অবস্থাতেই হয়ত যোগেশ আসিয়া হাসিয়া বলিত—"রমেশদা, ইচ্ছা করিলেই কিছু মায়া কাটান যায় না, ভেক লওয়া বরং সহজ, ত্যাগ করিতে পারে কজন, বন্ধন যে আপনা হইতে জোর করিয়া বাঁধিয়া বসে। ও সব ভাইল বুজরুকি ছাড়, বে-থা করিয়া সংসারী হও, বাবার মনে আর কষ্ট দিও না।"

রমেশ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, মনে মনে বলে—"এ কি হইল, সবই যাহার আয়ত্তের অতীত ছিল, তাহারই বাঞ্ছার ধন হইয়া চিরদিনের জন্য ধরা দিল, তবু আমি তাহাকে ভুলিতে পারি না কেন?" চট করিয়া রমেশ গভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিত। প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ অন্তরে অবস্থিত, বিষপূর্ণ অথচ মধুরিমময়, প্রত্যাখ্যাত অথচ জাগরূক সরযূর চিন্তাটাকে সে যতই তাড়া করিতেছিল, ততই যেন বাড়ীর পোষা পাখীটির মত সে আসিয়া পায়ের বেড়ী হইয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। রমেশ নিজের পায়ে ছুরি বসাইয়া এ বক্র বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিত না, কিন্তু চেষ্টা যে বিমুখ হইয়া প্রতিকূল ভাবে কার্য্যের উপর, চিন্তার উপর, পাঠের মধ্যে নিজের আধিপত্য আবিষ্কার

করিয়া বসে। না ছিল তাহার স্বাতন্ত্র্য, না ছিল বিচার বা বিবেকের কঠিন স্পর্শ। আত্মত্যাগের আদর্শ দেখাইতে গিয়া রমেশ জেতার জয় শব্দের মতই সরযূর কাণে ত্যাগের যে নূতন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিল, নিজে কি সে অসংযমের দড়ি গলায় জড়াইয়া সে মন্ত্র বিস্মৃত হইবে!

এমনই অবস্থায় তিন তিনটা মাস কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে মহাপ্রলয়ে যদি সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইত, রমেশ খেদ করিত না। সেদিনের দুপুরটা কেমন ফেকাসে ঠেকিতেছিল, আকাশে মেঘ নাই, অথচ ধোয়াটে আভায় পরিপূর্ণ, খর রৌদ্রটা কেমন ম্লান, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে রমেশ জানালার গরাদে মথা রাখিয়া অসাড়ের মত মাটিতে পড়িয়াছিল।

কালমুখে যোগেশ আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। রমেশ বিস্মিত হইল। সদা সহাস্য যোগেশের মুখ যেন সে আর এমনটি দেখে নাই। যোগেশকে সে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"যোগেশ, তোমার আজ কি হইয়াছে।" হাসিভরা আকাশ অন্ধকার দেখিয়া রমেশের মনে সন্দেহ হইল।

যোগেশ রমেশের গা ঘেসিয়া বসিল, ধীরে ধীরে বলিল— "একটা কিছু যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই রমেশদা, ভাল কি মন্দ তাহাই ঠাহর করিতে পারিতেছি না।"

রমেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল,—"হেয়ালী রাখ, যা বলিবার থাকে, বলিয়া শেষ কর যোগেশ?"

যোগেশ রমেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল—“তোমার সরযূ বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।”

রমেশ সমস্ত শক্তি এক করিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—“কি?” বলিয়াই সে আবার বসিয়া পড়িল।

যোগেশ বলিল—“যাহা ঘটিয়াছে, তাহাত বলিলাম।”

রমেশ উত্তর দিল না, যোগেশও মিনিট পনর চুপ করিয়া থাকিয়া আবারও তাহার হাত খানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—“ভাব দেখি রমেশদা, আমাদের দেশের বালবিধবাদের গতি কি হইতেছে।” এই ভাবে সে মনের কথাটা পাড়িবার চেষ্টা করিল। রমেশ কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। একবার মৌন দৃষ্টি করিল মাত্র। যোগেশ ভালমন্দ বিচার না করিয়া মনের অদম্য উচ্ছ্বাসটাকে চাপা রাখিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—“উনার বিরহে ত শিব শ্মশানবাসী হইতেছিলেন। আমি বলি, এবার শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বস, এদিক্ ওদিক্, দুদিক্ বজায় থাক।”

রমেশের ভীষণ ভ্রুকুটিকম্পিত মুখ ও সাদা ফেকাসে বর্ণ যোগেশের মনে ভয় আনিয়া দিল। রমেশ দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল— “কোন কথাই তোর মুখে আটক খায় নারে যোগেশ?”

যোগেশ দমিয়া গেল, তবু সে মনের বেগটা চাপিয়া রাখিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল—"কেন অন্যায়ই কি বলিয়াছি। বিধবাগুলোকে জাতায় পিষিয়া জ্বালাইয়া পোড়াইয়া না মারিলে কি তোমাদের ধর্ম্ম থাকে না, বরং তাদের বে দাও, নাকে দড়ি দিয়া ঘানিগাছে আর ঘুরাইতে যাইও না।"

রমেশ বেগে উঠিয়া দাড়াইল, যোগেশের হাতটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া জ্বলিত নেত্রে একবার দৃষ্টি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

[১২]

রমেশ চলিয়া গেলে যোগেশ সম্পূর্ণ পরাভব মানিল। রমেশের প্রতি তাহার সত্যকার ভালবাসা ছিল বলিয়াই এ দিক্ দিয়া সে একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। বিধবাবিবাহ বিরল হইলেও তাহা যে একেবারেই অসম্ভব, এ কল্পনাও তাহার ছিল না, তাহাতেই সে মনে করিয়াছিল, সরযূর বিধবা হইবার সংবাদে রমেশ সুখীই হইবে, হয়ত তাহার এই বন্ধুটি এলোমেলো পাগলামি ছাড়িয়া এ প্রস্তাবেই রাজি হইবে। এবার সে অন্য রকম বুঝিল, রমেশের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কোথায় গিয়া তাহাকে ধরিবে, চুপ করিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে রমেশ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল, গম্ভীর কণ্ঠে

বলিল—"যোগেশ, তোমার এই তিনটার গাড়ীতেই মধুপুরে যাইতে হইবে।"

অবাক্ হইয়া যোগেশ রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, রমেশ তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার উপর অপ্রত্যাশিত আঘাত করিয়া বলিল—"আমি বিবাহ করিব রমেশ, তোমার তারি ঘটকালি করিতে হইবে, মোহিনীবাবুকে পাকা কথা দিয়া সব ঠিক করিয়া আসিবে।"

দিনের আলোটা ক্রমঃক্ষিণ হইয়া পড়িতেছিল, যোগেশ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেমন একটা শঙ্কিত উদ্বেগের সহিত রমেশের মুখের দিকে চাহিতেছে, হঠাৎ রমেশের সঙ্গে কথা কহাও কঠিন, চুপ করিয়া থাকাও অসম্ভব। রমেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মনের এত বড় প্রলোভনটা কাটাইয়া উঠিবার অন্য উপায় নাই, বিষ দিয়াই বিকার কাটাইতে হইবে, সহসা সে যোগেশের হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল—"তোমায় যাইতেই হইবে যোগেশ, না বলিলে ত আমি শুনিব না।"

যোগেশ স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল—"সাপ লইয়া খেলা করিতে যাইও না রমেশদা, আমিত তোমায় না জানি, তা নয়; এ কি পারিবে?"

"আমায় ত পারিতেই হইবে রমেশ, এখন যে অসাধ্যসাধনই আমার কর্ত্তব্য।"

"ভাল করিয়া "ভাবিয়া দেখ, শেষে যেন খেয়ালের বশে পরের ঘাড়ে মড়া চাপাইও না।"

মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না যোগেশ, ওসব ভুল ভাবনা আমি কাটাইয়া উঠিয়াছি, তুমি যাও, যাতে শিগ্‌গির করিয়া কাজটা হইতে পারে, তাহাই করিবে।"

যোগেশ আর দ্বিরুক্তি করিল না, এই বন্ধুটির প্রতি তাহার বিশ্বাস বা ভক্তির অভাব ছিল না, সেই বিশ্বাস যোগেশকে অন্ধ করিল, রৌদ্রক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ছাতা না খুজিয়া সে নিরুদ্দিষ্ট ছায়াময় স্থানের সন্ধানে বাহিব হইয়া পড়িল।

যোগেশকে বিদায় করিয়া রমেশ ঘরের কোণে একটা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল, স্তিমিতপ্রায় দিনের আলোটা তাহার চোখে বিঁধিতেছিল, আপরাহ্ণ বায়ু যেন দম আটকাইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, রমেশ কষ্টে শ্বাস টানিতে লাগিল। কি করিতে গিয়া যে কি করিয়া বসিবে, সে চিন্তাটা যোগেশের কথায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। যোগেশ আসিয়া ডাকিল, বলিল—"এখনও বোঝ রমেশদা, আমি কিন্তু জামা চাদর লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি।" রমেশ জবাব দিল না, পড়িয়া রহিল।

টেবিলের উপরের ঘড়িতে একটা বাজিতে রমেশ উঠিয়া বসিল, জানালা গলাইয়া রাত্রির শ্বেত জ্যোৎস্না উদ্দাম গতিতে ঘরে ঢুকিতে-ছিল, রমেশ সে দিকে চাহিতে পারিল না, রাত্রির হিমশীতল

বাতাসের স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, জানালাটা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া সে আলো জ্বালিয়া কাগজ কলম লইয়া শুভ সংবাদটী পিতাকে লিখিয়া ফেলিল। খামখানা আটকাইয়া একটা সুগভীর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল, মনে মনে বলিল—"দুর্ব্বলতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার ত অন্য উপায় নাই, কমলার রূপ আছে, পারেত সেই পারিবে, আর কেহত আমার এ বিক্ষিপ্ত মনকে বুঝিবে না, সাম্‌লাইয়া চলিবার উপায়ও হইবে না।"

সহসা সরযূর কথা মনে হইতেই নব বৈধব্যের নূতন আচার-পালনের দৃশ্যটা মনে জাগিয়া উঠিল। রমেশ ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিল—"এই ভাবেই তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে সরযূ? তোমরা দুধ দিয়া যে কালসাপ পুষিয়াছিলে, সেত তাহার স্বভাব ছাড়িতে পারিবে না, বিষের তেজ ঢাকিয়া রাখিয়া যে তাহার পূজা করিবে, সে ত তাহারই অন্বেষণ করিতেছে।"

রমেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তাহার ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সরযূর কাছে শেষ বিদায়ের সহিত অশ্রুপূর্ণ চক্ষে শেষ করিয়া বাহির হইয়াছিল, আজ আবার সেই বিশৃঙ্খল শতছিন্ন জিনিষটাকে বাধিতে প্রবৃত্ত হইয়া অপটু হাতের আঁকাবাঁকা গ্রথিত গ্রন্থিগুলি কবে সে নিঃশেষে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। এতদিন সে ঘরবাহির আপনপর ভুলিয়া আলো-

আঁধারের বাহিরে সরযূর সৌভাগ্যের দিকেই চাহিয়াছিল, সরযূর সে সৌভাগ্যও বিধাতার সহিল না, একটা ঘূর্ণী বাতাস অকালে ফলহীন সজীব বৃক্ষটিকে গোড়াশুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া ফেলিল, শাখাপাতা শুদ্ধ সে যে অচিরেই শুকাইয়া উঠিবে! রমেশ ত এতদিন রোগকে রোগ বলিয়া গ্রাহ্য করে নাই, শোককে হৃদয়ে স্থান দেয় নাই, সংসারের অভাব অভিযোগগুলি তাহার কাছে একান্ত তামাসার জিনিষই হইয়া পড়িয়াছিল। এবার সে পাগলের মত বলিতে লাগিল—"যার জন্যে সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলাম, তারই জন্যে আজ আবার এ কঠোরতার আশ্রয় লইতে হইতেছে, দূরে যা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি, তাহাই কুড়াইয়া আনিয়া বুকে করিব।"

[১৩]

কমলার সাদা মনে কালীর লেশ ছিল না। সমাজের বাহিরে থাকিয়া এই মেয়েটি আবাল্য আবর্জ্জনাশূন্য, বিলের মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মটি, নীচের কাদার স্পর্শশূন্য, দূর পাড়ের ধূলিকণার লেশও তাহাতে পড়িতে পায় না, রবিকরে উদ্ভাসিত কমলের মত পিতামাতার আদরে যত্নে দিন দিন সে বাড়িয়া উঠিতেছিল, সংসার কেমন, মানবচরিত্র কেমন, প্রেমপরিহাস কখন কি ভাবে উদয় হয়, তাহা সে জানিত না, রমেশকে পাইয়া সে এই নিঃসঙ্গ নবীন জীবনে যেন প্রথমেই একটা নূতন

স্বাদ পাইল, রমেশ যেন তাহাকে কেমন নাড়াচাড়া দিয়া গেল, স্বচ্ছ আকাশের গায়ে একবিন্দু মেঘ দেখা দিল। তাহার অনধীন হৃদয়ের কোণে নূতন বীজ পতিত হইল, দৃষ্টিমাত্রেই কমলার সরল মন রমেশের জন্য স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠিল, এ স্নেহে প্রেম ছিল কি না, জানি না। স্বার্থের গন্ধও যে ছিল না, ইহা নিশ্চিত। রমেশ চলিয়া গেল, কমলা যেন অভাবের আভাস অনুভব করিল, একাকী বসিয়া সে রমেশের কথাই ভাবিত। মোহিনীবাবু বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, সহসা কমলার কেমন লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দিল, তাহার একান্ত নিশ্চিন্ত মন যেমনই চিন্তার আশ্রয় লইল, অমনি লাগাম ছাড়িয়া দিল, জ্যৈষ্ঠের উদ্গত শস্য বৃষ্টির ফোটা পাইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রমেশকে ছাড়িয়া কমলার একা একা ঠেকিতেছিল, পিতামাতার আদর বাড়িয়াছে, ভিন্ন কমে নাই, তবু যেন কমলা ছাড়া ছাড়া। বিবাহটা স্ত্রীলোকের কি, কতখানি, স্বামীর সঙ্গে কি সম্বন্ধ, এই নূতন ভাবনায় কমলা তন্ময় হইয়া পড়িত, যাহা কখনও ভাবে নাই, তাহাই ভাবিত, ভাবিতে ভাবিতে হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার মন সজাগ হইয়া উঠিত। মোহিনীবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিতেন—“কমলা, তুমি নাকি স্কুলে যাও নাই।”

“না বাবা স্কুলে আমি আর যাইব না, গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের ত এত বয়সে স্কুলে যাওয়া মানায় না।”

মোহিনীবাবু চমকিয়া উঠিতেন, সহসা কমলার মনের উপর এই বয়োচিত গাম্ভীর্য্য ও সাংসারিক কর্ত্তব্য জ্ঞান কে আনিয়া দিল। স্ফুটনোন্মুখ মন যে বিকশিত হইয়া পড়িল। বলিতেন—"এখানকার মেয়েরা সবাই স্কুলে যায়, ঘরের কোণে একা বসিয়া থাকা অপেক্ষা স্কুলে গিয়া লেখাপড়া করাত মন্দ নয় মা ?"

"রমেশবাবু কি বলিতেন জান।" বলিয়া কমলা থামিত, তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, ঢোক গিলিয়া বলিত—"তিনি বলিতেন 'মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা অনাবশ্যক, না হইলেও এমন আবশ্যক নয়, যারি জন্য সমাজ ও ধর্ম্মের পথকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, পারত উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে মেয়েদের শিক্ষার ভার দাও, জুতা আটিয়া সেমিজ গায়ে মেম সাজিয়া স্কুল কলেজে যাওয়া তাদের মানায় না।"

কমলা নীরবে কি ভাবিত, ভাবিয়া আবার বলিত—"আমাদের এ থেকে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত। আমি মনে করিয়াছি, এখন হইতে সংসারের কাজই করিব বাবা, পায়ের ওপর পা রাখিয়া বসিয়া থাকিতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

মোহিনীবাবুর মন বিচলিত হইত, চক্রান্ত করিয়া রমেশকে আনাইয়া সে কতখানি অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিত। দুদিনেই যে সে এমন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, তাহা ত তিনি জানিতেন না, কন্যাদায়গ্রস্ত

মোহিনীবাবু ইন্দুমাধবের প্রস্তাবে হাতে আকাশ পাইবার মত রমেশকে পাইয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, সেত ফাকি দিয়াই গেল, অধিকন্তু তাহার খাঁচার পাখীটিকে শিকল কাটার মত করিয়া রাখিল। তিনি উদ্বিগ্ন হইতেন, কন্যাকে লেখা পড়ার ঘোরে আচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া বলিতেন—"জানত মা, আমি এ সকল কথা মানি না, শিক্ষা ভিন্ন ত মানুষের উন্নতিও হইতে পারে না, সে স্ত্রীই হউক, আর পুরুষ হউক।"

কমলা কঠিন হইয়া উঠিত, আবারও বলিত—"রমেশবাবু বলিতেন যে, আমাদের ঘরের শিক্ষা যদি লাভ করিতে পার কমলা, তবেই দেখিবে, নারীর সৌভাগ্য কেমন করিয়া ফুটিয়া ওঠে, তাহার সৌরভে হিন্দু গৃহস্থ ঘর ভরপুর হইয়া উঠিবে, গৃহস্থের মেয়ের অন্য কোনও শিক্ষার অপেক্ষাই করিতে হয় না। আমি তাই করিব বাবা।"

মোহিনীবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিতেন— রমেশ ছেলে মানুষ, সে কি বলিত না বলিত, সে বিচার ত আমি করিতে চাই না।"

"ঐ দেখ, তুমি রাগ করিতেছ। কেন তিনি ত অন্যায় বলেন নাই, আমি যে ভাবিয়া দেখিয়াছি, ঐ ভাবে চলিতে পারিলেই আমাদের ঠিক চলা হইবে।"

মোহিনীবাবু হার মানিতেন, বিস্মিত মনে ভাবিতেন, যে কমলা তাহাকে ভিন্ন জানিত না, পোষাকপরিচ্ছদ, লেখাপড়া ছাড়া আর পৃথিবীর কিছুই তাহার প্রার্থিত ছিল না, তাহার এ পরিবর্ত্তন

কেমন করিয়া হইল। মানুষের মনের বৃত্তি যে একবার স্বাতন্ত্র্য পাইলে স্বাদ পাইলে নূতন ব্রতীর মত বেগে ধাইয়া চলে, তাহা তিনি এই প্রথম অনুভব করিতেছিলেন। একঘেয়ে চিন্তা ছাড়িয়া গৃহস্থঘরের কন্যা কমলার মন এদিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল।

সেদিন আকাশটা পরিষ্কার ছিল না, মধুপুর ঘিরিয়া যেন সন্ধ্যা হইতেই একটা প্রকাণ্ড কুয়াশা জাল পাতিয়া বসিয়াছিল, কমলা আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, রমেশবাবু আসিয়াছিলেন ত, চলিয়া গেলেন কেন? বিবাহে তিনি অসম্মত কেন? কমলা কি তাহার অযোগ্য। দূরে দূরে গাছগুলি কুয়াশার আবরণে আচ্ছন্ন, হইয়া ছিদ্রহীন সীমাহীন অন্ধকার মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, গাঢ় স্তব্ধ রাত্রি কমলার মনের উপর স্তব্ধতা আনিয়া দিল। দশটা বাজিতে মোহিনীবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিলেন, কমলা জানালা খুলিয়া খোলা আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ মা!"

কমলা ছোট্ট শ্বাস ত্যাগ করিল, বলিল—"না বাবা, তেমন ত কিছু ভাবিতেছি না।" কমলার প্রাণটা কেমন ছাৎ করিয়া উঠিল, রমেশ থাকিতে ত তাহাকে এমন একাটি বসিয়া ভাবিতে হয় নাই, সে যে সময়ই পাইত না, মোহিনীবাবু বলিলেন—"আজ ও পাড়ায় গিয়াছিলাম, নবীনবাবুর ছেলেটি বেশ, দেখিতেও সুন্দর, লেখাপড়ায়ও উন্নত।"

কমলা সে কথায় কাণ দিল না। বৎস যেমন আঘাত করিয়া গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ বাহির করে, মোহিনীবাবুও কমলাকে আঘাত করিয়া তেমনি মনের কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন —"ঐ ছেলেটির সঙ্গে যদি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে পারি, তবে একটা কাজের মত কাজই হয়।"

কমলা উত্তর করিল না, অন্ধকার রাত্রির আচ্ছন্ন আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

জুতার শব্দ করিয়া যোগেশ আসিয়া প্রবেশ করিল। নবাগত লোকটিকে দেখিয়া কমলা কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। লজ্জায় ঘাড় নীচু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগেশ নমস্কার করিয়া বলিল—"আমার নাম যোগেশ, কলিকাতা হইতে রমেশবাবু আমায় পাঠাইলেন।"

কমলা যাইতে যাইতে চমকিয়া দাঁড়াইল, মোহিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ? কোন প্রয়োজন পড়িয়াছে কি ?"

যোগেশ বসিয়া পড়িল. হাসিয়া বলিল—"হাঁ মস্ত প্রয়োজনেই আসিতে হইয়াছে। আপনার কন্যা কমলার সঙ্গে—"

কমলা ঘর ছাড়িয়া পলাইল, বাহিরে দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার সকৌতুক প্রশ্রয় পূরণ করিতে চেষ্টা করিল। যোগেশ বলিল —"রমেশবাবু কমলাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছেন,এবং যতশীঘ্র হয় শুভ-কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

কমলা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল, যেমনি কথা অমনি রমেশের জন্য তাহার মন উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া চলিল, অন্য সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া দিয়া মনে মনে বলিল—"আমি কি তাহার যোগ্য হইব ?"

[১৪]

বুকের উপর পৃথিবী শুদ্ধ চিন্তার বোঝা জড় করিয়া রমেশ মড়ার মত পড়িয়া ছিল, কখন যে তাহার নিদ্রাভারে শ্রান্ত অলস চোখদুটি বুজিয়া আসিল, তাহা সে টেরও পায় নাই। সহসা যোগেশের উচ্চ চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, বর্দ্ধমান দিনের আলোটা এই দরজা জানালাবদ্ধ গৃহটিকেও বাদ দেয় নাই। রমেশ মতিচ্ছন্নের মত দোর খুলিয়া দিয়া সম্মুখে যোগেশকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, সরযূর কচিমুখের উপর কাল দাগের কথা মনে হইতেই মন বিদ্রোহী হইল তীব্রকণ্ঠে বলিল—"যোগেশ তুমি যাওনি ত !"

যোগেশও চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—"কি বলিতেছ রমেশদা, পুরাপুরি ঠিক করিয়া তবে আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।"

বালকের মত যোগেশের হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া রমেশ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"নারে না, ও আমি পারিব না, যোগেশ তোরা আমায় মাপ কর।"

দিন তিনেক কাটিয়া গেলে ঝড়ের পরে স্তব্ধ প্রকৃতির মত রমেশ বসিয়াছিল, যোগেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ছোট কাল হইতে লাই পাইয়া তোমার এ দশা হইয়াছে রমেশদা, কিন্তু এবার আর সে হইবার যো নাই, নিজের খেয়ালে একজনার সর্ব্বনাশ করিবে, এত আমরা বরদাস্ত করিতে পারিব না।"

রমেশ মাথা নীচু করিয়া মিনতির স্বরে বলিল—"কি করিব যোগেশ, আমার যে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

"অসাধ্য এমন কিছুই নয়, ও সব তোমাদের খেয়ালের কথা, নভেলি প্রেম রাখিয়া দিয়া এখন কাজের কথা কও, আমি যে সব ঠিক করিয়া তোমার বাবাকেও চিঠি দিয়াছি।"

রমেশের বুকের মধ্যে বিছায় কামড় দিয়া ধরিল, অস্ফুট স্বরে সে বলিল—"যোগেশ, তোরা আর আমায় জ্যান্ত পোড়াইয়া মারিস না।" সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে পা বাড়াইতেই রতন আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"মা ঠাকরুণ আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।"

"তুই যা, আমি যাইতেছি।" বলিয়া রমেশ মুখ ঢাকিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া রতন দুই পা বাড়াইতেই উন্মত্তের মত ডাকিয়া কহিল—"নারে রতন, আমি পারিব না সে বাড়ীতে ঢুক্‌তে। বল গিয়া রমেশবাবু আসিলেন না।"

"আজ্ঞে"—বলিয়া রতন ফিরিয়া দাঁড়াইল, সুশীলা হইতে

আরম্ভ করিয়া সে বাড়ীর দুঃখদুর্দ্দশার সব কথা বলিয়া শেষ করিয়া রতন রমেশের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। বলিল —"বাবু কি করেন, এমন সময় আপনি অস্থির হইলে মা যে মারা পড়িবেন।"

রমেশ চোখের মধ্যে কড়া রকমের গোটা দুই ডলা দিয়া বলিল— "আচ্ছা, একটা গাড়ী ডাকিয়া আন্‌ত।"

গাড়ী আসিয়া থামিতেই রতন নামিয়া পড়িল, বলিল—"বাবু নামিয়া আসুন।"

যন্ত্রচালিতের মত রমেশ এক পা বাড়াইয়া রতনের কাঁধে হাত রাখিল, অতিকষ্টে আরও দুই পা বাড়াইল, দেখিল, গাড়ীর শব্দে সুশীলা নামিয়া আসিয়া স্থির মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

রমেশ রতনের কাঁধ ছাড়িয়া দিল, বজ্রাহতের মত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সুশীলা আসিয়া হাত ধরিতে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। সান্ত্বনা করিয়া সুশীলা বলিলেন—"অধীর হইয়া ত কোন ফল নাই বাপ, মানুষের চেষ্টা যেখানে অসমর্থ, সেখানে যে আমাদের মৌন অবলম্বনই শ্রেয়।"

সুশীলার সেই স্থির সংযত মূর্ত্তি ও বাক্য রমেশকে আরও উতলা করিয়া তুলিল, রমেশ কাঁদিয়া বলিল—"তোমায় ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না মা, আমার মত অকৃতজ্ঞকে আবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছ।"

"পাগল ছেলে"—বলিয়া সুশীলা থামিলেন, রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"পাগল আমি এখনও হই নাই, এই বড় আশ্চর্য্যের কথা, যার খাইয়া মানুষ হইয়াছি, আজ ইচ্ছা করিয়াই যে তার এ সর্ব্বনাশ দেখিতেছি, এতেও কি আমার পাগল হওয়া উচিত ছিল না।"

সুশীলা রমেশের পিঠে হাত দিয়া সজল চোখের করুণা ছড়াইয়া বলিলেন—"ইচ্ছা করিয়া কি মানুষ কিছু করিতে পারে রে রমেশ, এত জানিয়া এইটুকু জানিনা বলিয়াই আমরা কাঁদিয়া মরি।" একটু থামিয়া যেন বড় রকমের একটা আঘাত পরিপাক করিয়া লইয়া বলিলেন—"এত বড় আঘাতের দাগটা সারিয়া না উঠিতেই তোমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছি রমেশ, সে কেবল মায়াকান্না কাঁদিবার জন্য মনে করিও না, আজ আমি যে কথা বলিব, সে কথা তোমায় রাখিতে হইবে।"

রমেশ উত্তর করিল না, ভীত বিস্মিত দৃষ্টিতে সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুশীলা বলিলেন—"তোমার পিতা উপযুক্ত স্থানে সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছেন, তুমি কিন্তু এতে না বলিতে পারিবে না।"

সরযূ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, রমেশ অস্ফুটশব্দে "উঃ" করিয়া বুক ধরিয়া মুখ নীচু করিল। সুশীলা স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"বল রমেশ, আমার এ অনুরোধ তুমি অন্যথা করিবে না।"

"জীবন্ত গোর দিবার প্রথা কাজির আমলে ছিল শুনিয়াছি।" বলিয়া রমেশ আৎকাইয়া উঠিল।

সুশীলা আবার বলিলেন—"ভাবিয়া দেখ, এ তোমার এখন একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি সংসারী হইলে আমাদের ভারও বহন করিতে পারিবে।"

সরযুর দৃষ্টির সহিত রমেশের দৃষ্টি মিলিল, সে দৃষ্টি যেন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া মিনতি জানাইতেছিল।

রমেশ লাফাইয়া উঠিল, উত্তেজিত স্বরে বলিল—"সেজন্যে তুমি ভাবিও না, মা-বোনের প্রতি কর্ত্তব্য আমি প্রাণ দিয়া করিব।"

"তবুত মানুষের মুখ চাহিতে হইবে!" নিবীড় দুঃখে ক্ষোভে ও লজ্জায় সুশীলা মাথা নীচু করিলেন।

রমেশ সংযতস্বরে বলিল—"তুমি আমায় ঐ অনুরোধের হাত হতে অব্যাহতি দাও, আর যা বলিবে, তাহাই আমি স্বীকার করিব।"

"সে হইবে না রমেশ, বৃদ্ধ পিতার মনে কষ্ট দিয়া কোন্ কাজ সিদ্ধ করিবে?"

"আঘাত দিলেই সহ্য করিতে হইবে, এযে ভগবানের বিধান, এখানে ত পিতাপুত্র নাই মা!" বলিয়া রমেশ উদ্ধত হইয়া উঠিল। বলিল—"পিতাই তাঁহার কোন্ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, আমি সুপুত্র হইয়া কথা রাখিব।"

"পিতামাতার কর্ত্তব্য ত পুত্রের বিচারের বিষয় নহে।"

"সে দেখা যাইবে"—বলিয়া রমেশ চোখ চাহিল, সরযূ পাশে দাঁড়াইয়া মাটির প্রতিমার মত যেন ঝড়ের বেগে কাঁপিতেছিল, চোখ বাহিয়া অজস্র জলের ফোটা পড়িয়া নীচের ভূমিটাকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্দ্দাম গতিতে বাতাস শোঁ শোঁ করিতেছিল, দুপুরের রোদটা যেন প্রকাণ্ড জ্বালার ভার লইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রমেশ আর দাঁড়াইতে পারিল না, এদিক্ ওদিক্ কোন দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

[১৫]

বাসায় আসিয়া পা দিতেই যোগেশ বলিল—"শুনিয়াছ রমেশদা, কমলার পিতা মুমূর্ষু, কঠিন রোগে আক্রান্ত। তিন দিন কলিকাতায় আসিয়াছেন, এইমাত্র তোমাকে যাইবার জন্য খবর দিয়া গেল।"

"কলিকাতা আসিয়াছেন, কোথায়?" বলিয়া রমেশ জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ঘণ্টাখানিক পরে রমেশ ও যোগেশ আসিয়া রোগীর শয্যার একপাশে বসিল, কমলা তাহার পিতার পায়ের গোড়ায় বসিয়া নিঝোরে চোখের জল ত্যাগ করিতেছিল। পৃথিবীতে বাপ ছাড়া

তাহার আর কেহ ছিল না, সেই পিতার অন্তিম সময় জানিয়া এই উপায়হীনা রমণীর দুঃখ রাখিবার পথ ছিল না। যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কি রোগে মোহিনীবাবুর এমন অবস্থা হইল।"

কমলা চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া উত্তর করিল—"বাবাত গোড়া হইতেই হৃদ্রোগে ভুগিতেছিলেন, ডাক্তারের পরামর্শে প্রায় দশ বৎসর মধুপুরে একটু সুস্থ থাকিয়া এই কদিন হতে একেবারে সাঙ্ঘাতিক আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"

"ডাক্তার কি বলিলেন?"

"হঠাৎ কোন গুরুতর আঘাতে পুনর্ব্বার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখা দিয়াছে।"

রমেশের বুকটা বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। যোগেশ রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ এমন কি গুরু আঘাত পাইলেন?"

কমলা উত্তর করিল না। মোহিনীবাবু চোখ চাহিলেন, রমেশকে দেখিয়া তাঁহার অশান্ত মনে যেন একটা ক্ষীণ আশার উদয় হইল, সুবিশাল চিন্তার ছায়া হইতে মুমূর্ষুর মুখ যেন একটু মুক্ত হইল, অতিকষ্টে ডাকিলেন—"বাবা রমেশ!"

রমেশ সম্মুখবর্ত্তী হইলে তিনি তাহার হাত ধরিলেন, চোখ ভরিয়া জল ছাপাইয়া উঠিল, দুর্ব্বল রোগপাণ্ডুর হাতখানা কাঁপিতে

কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল, অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"বাবা, কমলা রহিল, ওর আর পৃথিবীতে কেহ নাই, তোমরা উহাকে দেখিও।" বলিতেই বৃদ্ধের বাক্‌রোধ হইয়া গেল, শ্বাসকৃচ্ছ্র দেখিয়া কমলা উচ্চ চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিয়া আছাড় খাইয়া মাটিতে লোটাইয়া পড়িল।

পিতার দাহ শেষে কমলা যখন স্নান করিয়া উঠিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিল, তখন তাহার দীর্ঘায়তন চোখদুটি ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছিল, অবসাদগ্রস্ত দেহখানা কোন মতে বহিয়া আনিয়া সে গঙ্গার পারে দাঁড়াইল। পৃথিবীতে কমলার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই, দশ বৎসর বিদেশবাস করিয়া মোহিনীবাবু বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্ক হইতে আপনাকে একেবারে খসাইয়া লইয়াছিলেন। নিরুপায় কমলা রমেশের দিকে করুণ দৃষ্টি করিল। অস্ফুট স্বরে যোগেশ বলিল—"একে মারিয়া ফেলিওনা রমেশদা, বিশ্বাস করিবার বা আপনার মনে করিবার তুমি ভিন্ন কিন্তু আর কেহ নাই, তুমি উহাকে আশ্বাস দাও, আশ্রয় দাও, যুবতী কন্যা তোমার আশ্রয় না পাইলে অঘোরে প্রাণ হারাইবে।"

রমেশ সে কথার উত্তর না করিয়া কমলার কাছে আসিয়া বলিল—"আপাতত চলুন, আপনাদের বাসাতেই থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দি, পরে অন্য ব্যবস্থা যাহা হয় করা যাইবে।"

কমলা সমস্ত শক্তি এক করিয়া ভীতা মৃগীর মত পূর্ণায়ত

চক্ষুর দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিল, কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল না, এই ব্যাকুল নিবেদন, মনের সমস্ত বাসনা ও কামনা নিরুপায়ের উপায় রমেশের চরণে সমর্পণ করিল। রমেশ বলিল—"আপনি ভাবিবেন না, পিতার অভাবের কষ্ট সে অবশ্যি নিবৃত্ত করিবার সাধ্য নাই, তা ছাড়া অন্য কোন অসুবিধা যাহাতে না ভুগিতে হয়, তাহা আমি করিব।"

কমলার প্রাণে আশ্বাসের পুলক জাগিয়া উঠিল, শোকের প্রবল প্রবাহ অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িতেছিল। রমেশ অগ্রগামী হইল, কমলা তাহার অনুসরণ করিয়া দিবাবসানের ছায়ার মত গৃহে প্রবেশ করিল।

যোগেশকে ডাকিয়া রমেশ বলিল—"এ বাড়ীতে তোমাকেই থাকিতে হইবে যোগেশ, আর কাহাকেও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

'তুমি না হয় আমাকে বিশ্বাস করিলে, কমলা ত তাহা পারিবে না, তোমাকেই এখানে থাকিতে হইবে, খেয়ালে পড়িয়া এই অনাথাকে প্রাণে মারিও না।"

"তোমার কেমন তর্ক করিবার স্বভাব, আমি থাকিলে অনাথাটি বাঁচিবে, আর তুমি থাকিলে মারা পড়িবে, তাৎপর্য্য ত বুঝিলাম না।"

যোগেশ না হাসিয়া পারিল না, স্মিত হাস্যে বলিল—"রাগ করিও না রমেশদা, বলত আমার সহিত এদের কি সম্বন্ধ ?"

"সম্বন্ধে আমিও বড় ঘনিষ্ঠ নহি যোগেশ !"

"সে হয়ত তুমি জান, কমলা তাহা জানে না, বোধ হয় জানিতে ইচ্ছাও করে না, তাহা ছাড়া তুমি ওর পিতৃবন্ধুর ছেলে, এতকাল এক সঙ্গে রহিয়াছ।"

রমেশ মাথা নত করিল, বলিল,—"যোগেশ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলাই ভাল, তোমাকে মধ্যে রাখিয়া আমাকে এখন দূরেই থাকিতে হইবে, ঘনিষ্ঠতার ফলে কমলা যেন শেষটা বিপদে না পড়ে। আমি ইহাদের বন্ধুর কাজ করিব, উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কমলার বিবাহ দিব।"

যোগেশের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"জান রমেশদা, কমলার পিতা তোমার অত্যাচারেই মারা পড়িয়াছেন ! ভদ্র লোকের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল, প্রাণাধিকা কন্যার বিবাহ। বড় নিরুপায়ে পড়িয়াই তোমাকে ধরিয়াছিলেন, আশা পাইয়া আশ্বস্তও হইয়াছিলেন, তুমি তাঁর ভরা বুক খালি করিয়া দিলে, প্রথম বারের আঘাতটা যদিও সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বারের কেলেঙ্কারীটাই একেবারে যম হইয়া দাঁড়াইল।"

রমেশের চোখের উপর সমস্ত পৃথিবীটা কাঁপিতেছিল, প্রবল ভূকম্প যেন তাহার পায়ের নীচের ভূমিটা সরাইয়া লইতেছে, এ কি বিভীষিকার ভীষণ দাহ, নিশ্চল নির্জ্জীব ভাবে দাঁড়াইয়া

নীরবে রমেশের অপরাধ যে কোন্ দিক্ দিয়া কত বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাই ভাবিয়া সে বার বার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

[১৬]

বসন্তের অলস মধ্যাহ্নে অবসন্ন আবেশের উত্তপ্ত জ্বালা বুকে করিয়া সরযূ একটা মাদুর পাতিয়া পড়িয়াছিল, যৌবনের উদ্দাম গতি তাহার দেহের উপর দিয়া, মরমের ভিতর দিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে নাড়াচাড়া করিতেছে। দীপ্ত দ্বিপ্রহরে কোকিল ডাকিতেছে, পাপিয়া তান তুলিয়া বেসুরা গাহিতেছে। বাতাস বকুলের তীব্র গন্ধ বহিয়া আনিয়া জানালা-পথে ঘরের মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িয়া ওলটপালট হইতেছিল। সরযূ মনে মনে বলিল - "নবীন জীবনে অপূর্ণ মনোরথের সম্ভার সম্মুখে সাজাইয়া আমার এ কোন্ শাস্তি, কি এমন অপরাধ করিয়াছি!"

আকাশবাতাস কেহই তাহার দুঃখপূর্ণ বাক্যগুলি কাণে তুলিল না, ধীর সমীর যেন গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুশীলা আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"সরযূ রান্না হইয়াছে মা, স্নান করিয়া খাবি আয়।"

সরযূর নিকট সারা পৃথিবী বিস্বাদ ঠেকিতেছিল। আহারের কথায় বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। নব বৈধব্যের দারুণ ক্লেশ বোঝা করিয়া ঘাড়ে চাপাইবার জন্য স্নেহময়ী জননী যেন পাষাণ-

কঠোর হইয়া উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছেন। অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া সরযূর প্রাণ পালাই পালাই করিতেছিল, সে আজ আর আত্মসংযম করিতে পারিল না। মনের বেগে বলিয়া উঠিল—"ভোগসুখেত আমার আর রুচি নাই মা, সে পালা শেষ করিয়া দিয়াছি। পিণ্ডী যে আমি গিলিতেও পারি না, আজ নয়ত উপোষ করিয়াই থাকিব।"

ভাদ্রের ভরা বর্ষার মন্দীভূত স্রোত মৃদুমন্থর গতিতে সরযূর দৃঢ়তা ও সংযম ভাসাইয়া লইতেছিল। মাতা শঙ্কিত হইলেন, চোখ মুছিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন—" কি কর্‌বি বলত মা, অদৃষ্টের ভোগ যে ভুগিতেই হইবে।"

অতর্কিতে কথাটা বলিয়াই সরযূর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, ছলছল নেত্রে মাতার দিকে চাহিলে সুশীলা আবার বলিলেন—"অদৃষ্টকেই বা দোষ দিয়া কি করিব, আমাদের কাজইত এ পোড়া অদৃষ্ট সৃষ্টি করিয়াছে। এতে যে দুঃখ করিবার অধিকারও নাই। ভগবানের বিধান মাথা পাতিয়া লইতে হইবে।"

আবার সরযূর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কি পাপে তাহার জন্য এই বিধানের সৃষ্টি হইয়াছে, সে এমন গর্হিত কাজ কি করিয়াছে যে, নব-যৌবনে সন্ন্যাসিনী সাজিয়া সম্মুখের রাশীকৃত ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিতে যাইবে। কেহ দেখিবে না, একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, অথচ প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়া অফুরন্ত

দুঃখ, তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। কাতর কণ্ঠে বলিল—"তুমি যাও মা, আমিও চান করি গিয়া। দুরদৃষ্ট বা শুভাদৃষ্ট যে কথাই বল না কেন, মানুষকে পোড়াইয়া মারিতে এ সমাজ যেমন জানে, এমন ত আর কেউ জানে না।"

আহারের পর সরযূ একটা বাঙ্গলা পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিতেছিল। অনেকদিন পরে রমেশ আজ এ বাড়ীতে ঢুকিল, সুশীলার ঘরের দিকে না গিয়া একেবারে সরযূর শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া বিচার বিবেচনা ভুলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আমি জানিতে চাই সরযূ, তুমি এখন কি করিবে?"

প্রশ্নটার অর্থ সরযূ বুঝিল না, তাহার বুকের রক্তগুলি অনাবশ্যক ভাবে মুখে গিয়া উঠিল, সেও কঠিন হইয়া উত্তর করিল—"করিবার যাহা আছে, তাহা ত তোমরাই করিবে, ভাগ্য তোমরা পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলে, আরও ভাগ্য যে এই স্বেচ্ছাচারের রাজ্যে তোমাদের জন্ম হইয়াছিল, আমাদেরত কিছু করিবার নাই, পাঠশালার সুবোধ বালকের মত তোমরা যাহা করাইবে তাহাই, করিব।"

রমেশের বুকটা ভাঙ্গিয়া গেল, সরযূর মনের ভাবটা সে আদৌ বুঝিতে পারিল না, বলিল—"আমরা করাইব তার মানে? তোমার যেমন ইচ্ছা করিতে পার। আমিও আজ সে কথা জানিতেই আসিয়াছি, তোমার কাছে পরিষ্কার শুনিয়া আমার পথও

আমি ঠিক করিয়া লইব। মানুষের দোষ দিয়া কি করিবে সরযূ, যে যাহা সৎ বলিয়া মনে করে, তাহাই বলিয়া যায়।"

সরযূ উঠিয়া বসিল, বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"সৎ, যত সৎ কি নূতন করিয়া আমার মত বিধবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।" বলিয়া সরযূ ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রমেশের দোলায়মান হৃদয় আবারও দোল খাইয়া দ্বিগুণবেগে নড়িয়া উঠিল, দূর গাছের ডালে কোকিল ডাকিতেছিল। সরযূর বুকের ভিতর-বাহির সমানে স্পন্দিত হইতেছে, গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"তোমার যা কর্ত্তব্য তুমি করিতেছ, আমার কর্ত্তব্যও আমি বুঝিব, কিন্তু এ অসময়ে এখানে কেন বলত ?"

আচ্ছন্ন মনের বেগটা অতিশয় উদ্দাম হইয়া উঠিল। অনিচ্ছায় প্রাণপণ করিয়াও রমেশ এতদিন সরযূর নিকট হইতে দূরে দূরেই রহিয়াছে, কি করিবে, কোন্ পথ ধরিবে, তাহারই স্থির নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই যেন আজ তাহার এই কঠোর প্রয়াস, স্খলিত কণ্ঠে বলিল—"আমি পাপিষ্ঠ, সেজন্যে যে দুঃখ তাহাত ঘাড় পাতিয়া লইয়াছ। জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, চিরকাল অনুতাপে পুড়িয়া মরিব, না—।"

সরযূর চোখ দিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতেছিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, সে তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জিয়া বলিল—"না ত কি ?

'এখান হইতে যাও রমেশদা, কেন আসিয়াছ বলত, যাও যাও, আমাকে আর পুড়িয়া মারিও না।" বলিয়া দুই হাতে চোখ দুটা চাপিয়া ধরিয়া অবসন্নের মত ধপাস করিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে ক্রমবিচ্ছিন্ন রৌদ্রটা পড়িয়া আসিলে সরযূ ঘর ছাড়িয়া মায়ের পায়ের তলায় গিয়া বসিল দৃঢ়স্বরে বলিল—"মা, কালই কিন্তু আমায় শিবপূজা লইতে হইবে।"

সুশীলা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব পড়িতেছিলেন, কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন—"কাল না তুমি বারণ করিলে সরযূ, আমি যে ভট্‌চাজ মশায়কে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছি।"

"সে কথা বলিলে ত চলিবে না, এখুনি রতনকে পাঠাইয়া সংবাদ দাও।" বলিয়া কন্যা মাতার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই রতনের উদ্দেশ্যে উঠিয়া গেল।

[১৭]

কমলা ভারি আশ্রয় পাইল, স্বনীড়-পরিত্যক্ত কোকিলশাবক-টিকে যত্নে কুড়াইয়া লইয়া কাক যেমন আশ্রয় দেয়, পিতার মৃত্যুর পর পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত ইন্দুমাধববাবুও কলিকাতায় আসিয়া কমলাকে ঠিক সেইভাবেই আশ্রয় দিলেন। সরলপ্রাণা কমলার মধুময় ব্যবহারে পরম পুলকিত ও আপ্যায়িত হইয়া বৃদ্ধের প্রাণের স্নেহ যেন ধারার

আকারে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত পিতৃশোকের অন্তঃসন্তাপে সন্তপ্তা কমলার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অনাবৃষ্টিতে শুষ্কপ্রায় কমলার মনও ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের কোণে বিদ্যুৎ দেখিয়া ভরসা পাইল।

যদিও সাংসারিক কাজের সহিত কমলার শিক্ষাদীক্ষার মোটেই সামঞ্জস্য ছিল না, তথাপি কোনও কাজে "না" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লওয়া অতিবড় লজ্জার কথা এবং ইন্দুমাধববাবুর দুঃখের কারণ হইবে, এমনই তাহার মনে হইত। এখন আর সে পৃথিবীর অনাবশ্যক ধূলাকাদা ঝাড়া বিলের ফোটা কমলটী নাই, এ যেন বাড়ীর দেবপূজার শেফালীটি। আসিয়া অবধি মনের কান্না মনেই চাপিয়া রাখিয়া নূতন বাসার ঘরদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া রান্নাবান্নায় পর্য্যন্ত কমলা তাহার অনিপুণ মনকে নিয়োগ করিয়া দিয়াছিল। রমেশের ব্যবহারেই পিতা মারা পড়িলেন, তবু তিনি তাহাকে রমেশের হাতের উপর দিয়া গিয়াছিলেন, একথা মনে করিয়া কাজকর্ম্ম হাসি-কান্নার মধ্যে সর্ব্বদার জন্যই এমন একটা আনন্দময় গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছিল, যাহা দেখিয়া ইন্দুমাধববাবু পীড়নের পরিবর্ত্তে শান্তিই লাভ করিতেছিলেন। কমলার কাজ কথা, আহার ব্যবহার এমনই একটা সৌন্দর্য্য ও সমারোহে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার আড়ালে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া ইন্দুমাধব তাহার এই নবীন

যৌবনের উদ্গত বাসনাগুলিকে দিন দিন পুষ্ট পরিস্ফুট দেখিতে-ছিলেন। কমলার দেহে ক্লান্তি ছিল না, মুখে শ্রান্তি ছিল না, পিতৃহীনার অদৃষ্টকে ধিক্কার করিবার অবসরটুকুর জন্যও যেন রাত্রির অন্ধকারের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। সকালে সকলের আগে উঠিয়া পিতার জন্য যেমন করিত, ঠিক তেমনই চা প্রস্তুত করিয়া ইন্দুমাধব বাবুকে গিয়া বলিত—"আপনার চা আনিয়াছি, খাবেন, আসুন।"

ইন্দুমাধব বিস্মিত হইতেন, হাসিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিতেন—"তুমি মা সবাইকে হার মানাইয়াছ, এত সকালে নাকি চা খাইতে হয়।"

"বাবা যে খাইতেন।"

ইন্দুমাধব আর উত্তর করিতেন না। তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটি হাতে লইয়া বলিতেন,—"মা আমার লক্ষ্মী, বাপ কিন্তু তোমার যথার্থ নামটিই রাখিয়াছিলেন।"

কমলা কথা বলিত না, মাথা নীচু করিয়া অন্য কার্য্যে চলিয়া যাইত, নয়টা বাজিতে না বাজিতেই আবার তাগাধা লইয়া হাজির হইত,—"এই দেখুন আপনি এখনও স্নান করিতে যান নাই, আমি যে আহ্নিকের আয়োজন করিয়া রাখিয়া আসিলাম।"

"যাই মা!" বলিয়া ইন্দুমাধব শোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া আটিয়া বসিতেন। কমলা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিত—"যাই বলিলে ত চলিবে

না, এখুনি যাইতে হইবে, দেরি করিলে যে পিত্তি পড়িয়া অসুখ করিবে।”

ইন্দুমাধব হাসিতেন, বলিতেন—“বুড় বয়সে পিত্তি পড়িবার ভয়ে মা আমার পাগল হইয়া উঠিয়াছে।”

কমলা ইহা বুঝিতে চাহে না, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ইন্দুমাধব বুড়া যুবক যাহাই হউন, তাঁহার স্বাস্থ্য তাঁহার তুষ্টি লইয়াই কমলার দরকার। ইন্দুমাধববাবুই কমলার সান্ত্বনা, আশাভরসা। ডাগর চোখদুটি ম্লান করিয়া কমলা বলিত—“ঐ কেমন আপনার কথা, বুড়দের যেন অসুখ হইতে নাই।”

ইন্দুমাধব কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া স্নানের জন্য উঠিয়া যাইতেন।

পূর্ণিমার রাত্রি হাসিতেছিল, মুমূর্ষুর শ্বাসপ্রশ্বাসের মত সমস্ত বিশ্বের উপর দিয়া একটি একটানা মৃদু বাতাস কুসুমগন্ধ লইয়া প্রভুবিরাগভীত নূতন ভৃত্যের মত পা টিপিয়া চলিয়া যাইতেছে। কলিকাতার অসংখ্য হর্ম্ম্যপুঞ্জের মাথার উপরে কীরিটের মত জ্যোৎস্নার ছায়া পড়িয়াছে, নীচে আলিসার গায়ে গাঢ় ম্লানিমা, যেন হাসিরাশি-পরিত্যক্ত শিশুর পাদুখানি। কমলা রান্নাঘরের একটা কোণে মুড়িসুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল, রমেশ বারাণ্ডা হইতে উচ্চ গলায় ডাকিল—“ঠাকুর!”

কমলার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কেরোসিনের

ল্যাম্প হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া লজ্জায় কুণ্ঠায় মধুর স্বরে বলিল—"ঠাকুর অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, আপনি খাবেন আসুন।"

"আহার আমি সারিয়া আসিয়াছি, দয়া করিয়া এক গ্লাস জল আমাকে দিতে হইবে। বলুন ত, ঠাকুর চলিয়া গেল, আব আপনি এখনও বসিয়া কেন?"

কথার শ্রীতে কমলার সারা শরীর কাঁপিয়া উঠিল, মুঠার ভিতরে আবদ্ধ জিনিষটা কেমন দূর দূর ঠেকিতে লাগিল। নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধির দৃঢ়তা না থাকিলেও মৃত্যুর পূর্ব্বের পিতার সেই করুণ আবেদন যে রমেশ উপেক্ষা করিতে পারিবে, ইহা কমলা ভাবনায়ও আনিতে পারে নাই। সংশয়সঙ্কুল দ্বিধায় তাহার বাকরোধ হইয়া আসিতেছিল, মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া অতিকষ্টে বলিল—"আপনার জন্যে যে আহার্য্য প্রস্তুত রহিয়াছে।" আর সে বলিতে পারিল না, অভিমানের সলজ্জ প্রতিকৃতি প্রতিকূল হইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল।

রমেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া পিড়ীতে বসিয়া পড়িল। কমলা ভাতের থালা আনিয়া দিয়া গৃহভিত্তির উপর ভর রাখিয়া রমেশের শ্বাস গণিতেছিল। রমেশের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে কি? এই মানুষটির অযথা অত্যাচারের আঘাতেই পিতার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল, ডাক্তারবক্ত স্পষ্টই সে

কথা বলিয়াছিল, অদৃষ্টের দোষ দিয়াও ত পরিত্রাণ নাই। কোন্ সাহসে রমেশকে সে পতি বলিয়া গ্রহণ করিবে। তা ছাড়া যে উপায়ও নাই, পিতা যে তাহাকে রমেশের হাতেই দিয়া গেলেন; অবাধ্য মনও ত বুঝিতে চাহে না। সে যে কি করিলে তাহার এই আরাধ্য দেবতাটিকে তুষ্ট করিতে পারিবে, এই উৎকণ্ঠিত চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পূজার আয়োজন শেষ করিয়া যুক্তকরে বসিয়া আছে। ধূপধূনার পূত গন্ধে কমলার হৃদয়ের এ কোণ ও কোণ ভরিয়া উঠিয়াছে, ঝম্ ঝম্ শব্দে চারিদিকে মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিতেছে, অবারিত মুক্তদ্বার মণ্ডপ শূন্যবুকে দেবতার জন্য আকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, দেবতা কি আসিবেন না, একবার উঁকি দিয়াই চলিয়া যাইবেন, আসিলেও কি কমলা তাহাকে বুকে ধারণ করিতে পারিবে না? কমলার মনের আশা কি পূর্ণ হইবে না, হৃদয় যে হৃদয়ের দেবতার জন্য সর্ব্বস্ব লইয়া পথের মাঝে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কি দেবভোগে লাগিবে না, পথে ঘাটে দীনদুঃখীকে বিলাইয়া দিতে হইবে! কমলা তন্ময় হইয়া পড়িতে ছিল, সহসা রমেশ, উঠিতে যাইতেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কুণ্ঠিতস্বরে বলিল —"না না আপনি উঠিবেন না, এই দুধ রহিয়াছে, খাইয়া নিন।"

রমেশের কথা বলিবার শক্তি ছিল না, যন্ত্রচালিতের মত কমলার কথাগুলিই প্রতিপালন করিতেছিল। দুগ্ধের বাটী আনিয়া দিতে এক চুমুখে দুধটুকু নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার

কমলার দিকে চাহিল, পরে গভীর একটা শ্বাস ত্যাগ করিয়া ত্বরিতপদে ঘরের বাহির হইয়া, ধরা গলায় বলিল—"আপনি আর যেন এমন করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। আমার ত বাড়ী আসার কোন ঠিক নাই, ঠাকুর যদি না থাকে, কাল হইতে নয়ত আর আসিবই না।"

কমলার চোখ তখন ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সহসা পিতৃশোকের স্পষ্ট আক্রমণে সে ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ধপাস্ করিয়া সেই রান্নাঘরের মেঝেতেই বসিয়া পড়িল। তাহার পূর্ণ মন যেন মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া গেল।

[১৮]

"বাবা, এ বড় অন্যায় হইতেছে, ভদ্রলোকের মেয়ে, তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া ঠাকুর চলিয়া যায়, তুমি ঠাকুরকে বলিয়া দিও।"

বিস্ময়ে ইন্দুমাধব রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের কথা বলিতেছ রমেশ?"

"ঐ দেখ, তুমি কোন খোজই রাখনা, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া তাহার জন্য কি ভাবিতে হয় না!"

কথাটা যে কমলার উদ্দেশ্যে হইতেছিল, গোড়াতেই ইন্দুমাধব তাহা বুঝিয়াছিলেন, তবু একটু নাড়া দিয়া পুত্রের মনের ভাবটা বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়া বলিলেন—"আমিত কমলাকে

পর ভাবিনা রমেশ, মোহিনী যে তাহাকে তোমার হাতেই সঁপিয়া দিয়া গিয়াছে।"

রমেশ উত্তর করিতে পারিল না, ইন্দুমাধব আবার বলিলেন—"কমলাকে পর হইতে দিতে আমার প্রাণও চায় না, এমন লক্ষ্মী মা আমার। দেখ রমেশ, আমার কথা রাখ, তুমি আর এতে অমত করিও না।"

নিরুপায়ে পড়িয়া রমেশকে পলাইতে হইল। যোগেশকে ধরিয়া বসিয়া বলিল—"যোগেশ, তুমি আমায় এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর।"

"তোমার বিপদ্ রমেশদা ?"

"হাঁ বিপদে আমিই পড়িয়াছি, তোমায় কিন্তু আমাকে সে বিপদ্ হইতে রক্ষা না করিলেই হইবে না।"

যোগেশ কথাটা ভাল বুঝিল না, রমেশও বলি বলি করিয়া কেমন এতক্ষণ বলিতে পারিতেছিল না, এবার অনেকটা দৃঢ় হইয়া বলিয়া উঠিল—"কমলাকে তুমি বিবাহ কর যোগেশ, বাবাও সন্তুষ্ট হইবেন, কমলাও সৎপাত্রে পড়িবে, আমিও নিশ্চিন্ত হইব।"

যোগেশ মুচ্‌কি হাসিল, বলিল—"তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলে বাবা যে বড় অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহাত মনে হয় না, পাত্রও আমি তোমা অপেক্ষা বড় সৎ হইব না!"

"আমি অক্ষম যোগেশ!"

"কিসে ?"

কিসে সে কথা রমেশ বলিতে পারে না, যে হৃদয়ের পরতে পরতে সরযূর স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, সে হৃদয়ে রমেশ অন্য কাহাকেও স্থান দিবে কোন্ সাহসে। তাহাতে যে জ্বালাই বাড়িবে। এ বরং নিজে পুড়িতেছে, বিবাহ করিলে যে অগ্নির সৃষ্টি হইবে, তাহাতে কমলাও পুড়িয়া মরিবে, একা যদি তাহার উপর দিয়াই যাইত ত, রমেশ না হয় স্বীকার করিতে পারিত, কিন্তু পরের মেয়েকে মারিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। গম্ভীর হইয়া বলিল—"সে না হয় পরে শুনিবে, আগেত আমার অনুরোধ রক্ষা কর।"

"জঞ্জাল কুড়াইয়া আনিয়া পরিষ্কার করিব, সে শক্তি আমার নাই, জানত এর জন্য আমি চিরকাল জঞ্জালকে ভয় করিয়া চলি, অনুরোধে ঢেঁকি গিলিলে যে বদহজমি হইবে।"

রমেশ রুষ্ট হইয়া উঠিল, তীব্রকণ্ঠে বলিল—"আমার একটা অনুরোধও রাখিতে পার না যোগেশ?"

"বৃথাই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছ রমেশদা, শক্তি থাকিতে কবে তোমার কথা ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, শক্তির অভাব হইলে কি হয়, তাহাত নিজে না বুঝিতেছ, তাহা নহে, অনুরোধও তোমার অপেক্ষা আমার বড় নহে।"

রমেশ এবার বিষম ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। যোগেশ যে তাহাকে কথায় কথায় চাপিয়া ধরিয়া শ্লেষ করে, কর্ত্তব্যহীন বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহা সে আজ আর সহ্য করিতে

পারিল না, রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"তোমরাও যে বড় কর্ত্তব্য রক্ষা করিতেছ, এমন ত মনে হয় না, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া কথা নাই, বার্ত্তা নাই, একেবারে আপন করিয়া লইয়াছ।"

"এ অনুযোগ বাবাকে দিলেই ভাল হইত রমেশদা!" বলিয়া যোগেশ আবারও হাসিল।

আঘাতটা ফিরিয়া আসিয়া রমেশের ঘাড়েই পড়িল। সে হতাশের মত বসিয়া পড়িয়া বলিল—"বিবাহ যদি নিতান্ত নাই করিতে পার, বাবাকে একবার বলিয়া আইস, তিনি যেন কমলার বিবাহের অন্য চেষ্টা দেখেন।"

যোগেশ মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমি তাহা পারিব না।"

"কি পারিবে না যোগেশ?"

"এটাও না, ওটাও না, বরং তুমিই মাথা ঠিক কর, আকাশ-কুসুমের আশা ত্যাগ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাও।"

রমেশ গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল—"মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই বলিতেছ যোগেশ!"

যোগেশ টলিল না,—"মিথ্যা ত এমন বলি নাই, আগুন দেখিয়া কেন উড়িয়া যাইতেছ, সে যে স্পর্শমাত্রেই পোড়াইয়া মারিবে। দেবতাকে নমস্কার করিয়া আইস, এযাত্রার মত দুরাশাকে ভাসাইয়া দাও, কমলা তোমার অযোগ্য হইবে না।"

রমেশ চটিয়া লাল হইয়া উঠিল, কর্কশ বাক্যেই বলিল—"দেখ

যোগেশ, উপদেশ কুড়াইতে আমি আসি নাই, কেন না, এ বাজারে আর যাহারই অভাব হউক, ওটার অভাব নাই। ঢাকা না দিলে তাহার বর্ষণে যে ভাসিয়া যাইতে হয়।"

যোগেশ স্বর খাট করিয়া রমেশের হাত ধরিয়া বলিল—"দুরাশাকে পোষণ করিয়া লাভ রমেশদা, যাহা ধর্ম্মে সহিবে না, সমাজ সহিবে না, নিজের বিবেক পর্য্যন্ত যাহাতে মারা যাইবে, বুঝিয়া শুনিয়া কেন তেমন কাজের জন্য লালায়িত হইতেছ—"

রমেশ হাত ছিনাইয়া লাফাইয়া, উঠিল, বলিল—"যোগেশ সাবধান, অনেক কথা তোমার হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, কিন্তু এ আমি সহ্য করিতে পারিব না, এমন অপবিত্র তোমার মন, তাহাত জানা ছিল না, জানিলে গোড়া হইতেই সাবধান হইতাম।"

যোগেশ মনে মনে বলিল—"তোমা অপেক্ষা নহে।" প্রকাশ্যে বলিল—"দেখ রমেশদা, তুমিও আমায় জান, আমিও তোমায় না জানি এমন নহে, তোমার মনে কষ্ট দি সে ইচ্ছাও আমার নাই, বন্ধু বলিয়া যাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি, তাহাই বলিতেছি। ছাই চাপা আগুন বেশী দিন ঢাকা থাকে না।"

রমেশের মুখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, যোগেশ আবার তাহার হাত ধরিল, বলিল—"রাগ করিও না, সত্য করিয়া বলত তুমি আজও সরযুর আশা রাখ কি না?"

গর্ব্বদর্পিত উক্তিতে রমেশ বলিল—"না, সে চিন্তা আমি

ছাড়িয়া দিয়াছি! আর রাখিলেই দোষ? ভাবিয়া দেখ যোগেশ, সরযূ সম্বন্ধে তুমিই একদিন কি উপদেশ দিতে আসিয়াছিলে!"

"ভুল করিয়াছিলাম, হিন্দু বিধবারা যতই উপায়হীনা হউক, এপথ তাহাদিগের প্রশস্ত নহে, ইহা সেদিন বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি, যতই ভাবিতেছি, ততই দেখিতেছি, ও ভাবনা ভাবিবার উপযুক্তই নহে। তুমি কিন্তু মিথ্যা বড়াই করিতেছ রমেশদা, ওতে হয়ত অন্যকে ভুলাইতে পার, যোগেশকে পারিবে না।"

[১৯]

দুপুরের আহার সারিয়া কমলা ঘরের মেঝে শক্ত সিমেণ্টের উপর পড়িয়াছিল। ধীরপদে রমেশ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, কমলা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া স্রস্ত বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মুখ নীচু করিল।

সাহস সঞ্চয় করিয়া রমেশ গৃহে প্রবেশ করিল, সম্মুখের চৌকীর উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"মধুপুরের বাসায় আমাকে দেখিয়া আপনি ত লজ্জা করিতেন না, বরং হাসিমুখে কত কথাই বলিতেন, এখানে এত লজ্জা কেন, সর্ব্বদাই যেন জড়সড় হইয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই।"

রমেশকে দেখিলেই কমলার মন কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিত, এক দিকে পিতৃস্মৃতি, আর এক দিকে অবাধ্য মনের কঠিন পীড়ন,

কমলার মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিত; তাহার উপর রমেশের দূরত্ব রক্ষার চেষ্টা ও যোগেশের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব কমলার অবিদিত ছিল না, কাজেই অকারণ ঘনিষ্ঠতায় সে মনে মনে লাল হইয়া উঠিল, তাহার হতাশ মন বুভুক্ষিতের মত রমেশকে চাপিয়া ধরিতে চাহিল। আঘাত পাইয়া কমলা দৃঢ় হইয়া উঠিল। রমেশের কথাটা শ্লেষের মত লাগিল, বলিল—"কারুকে ত দোষ দেওয়া চলেনা রমেশবাবু; আপনিই কি আর তেমনি আছেন, ক্রূর গ্রহ দেখিয়া যে পালাই পালাই করিতেছেন।"

রমেশ আহত হইল, সুখে-দুঃখে আহারে-বিহারে কর্ম্মে-কৌতূহলে সর্ব্বপ্রকারে আশ্রিতা কমলার কথার উত্তর দিতে তাহার প্রাণেও আশঙ্কা হইল, সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—"সে কথা যাক, যাহা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, আগে তাহাই বলিয়া শেষ করি।" বলিয়া রমেশ থামিল, কমলা একবারমাত্র সকৌতূহল ভীত দৃষ্টি তুলিয়া নামাইয়া লইল।

রমেশ বলিল—"যোগেশকে ত আপনি দেখিয়াছেন, সে দেখিতেও যেমন, তার স্বভাবও তেমনি, লেখাপড়ায়ও তার মত ছেলে আজকালের বাজারে মেলে না।"

কমলা উত্তর করিল না, রমেশও নিজের উদ্দেশ্যটা বলিতে গিয়া কেমন থমকিয়া যাইতেছিল, কাজেই এবারও তাহাকে বলিতে হইল—"আমার বন্ধু বলিয়া একথা বলিতেছি মনে করিবেন না।

কেননা আমার সহিত তাহার তুলনাই হয় না, পূর্ণিমার চাঁদ আর জোনাকিপোকায় যত তফাৎ, ঠিক ততই তফাৎ হইবে।"

কমলা ধৈর্য্যহারা হইতেছিল, প্রাণ খুলিয়া রমেশের সহিত আলাপ করিবে উপেক্ষিতার সে শক্তিত ছিলই না, তাহার উপর অযথা বাক্‌বিতণ্ডায় চিত্তের অবসন্নতা বাড়িয়াই উঠিতেছিল, ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—"এখানে তাঁহার প্রশংসা করা আর কাঁটা বনে মুক্তা ছড়ান একই কথা, আমিত তাঁহার গুণগরিমা অনুভব করিবার শক্তি রাখি না,—বলিয়া লাভ!"

তবু রমেশ মনের কথাটা বলিতে পারিল না, "লাভালাভ যে কিসে, সেত সব সময়ে বোঝা যায় না, হয়ত আজ যাহাকে লোক্‌সানের মনে করিতেছি, কাল সেই পরম লাভের লোভনীয় বস্তু হইতে পারে। আজ যাহাকে পর বলিয়া ভাবিতেছি, সেই পরম আদরের আপনার হইবে, তার মত আপনার দ্বিতীয় আছে বলিয়া তখন আর মনেও হইবে না।" বলিয়া রমেশ থামিতেই কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"একি আপনি যে উঠিয়া পড়িলেন, আমার কথাটাত এখনও শেষ হয় নাই।"

"আমি যে আর বসিয়া থাকিতে পারি না, আপনার বাবা হয়ত উঠিয়াছেন, তাঁকে হাতমুখ ধুইবার জল দিতে হইবে।" বলিয়া কমলা পা বাড়াইল।

রমেশ তাড়াতাড়ি বলিল—"না, আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না, পাঁচসাত মিনিট যদি অনুগ্রহ করিয়া অপেক্ষা করেন।"

ধিক্কারের বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে কমলা বসিয়া পড়িল, বলিল—"কাকে কি বলেন রমেশবাবু, আমি যে আপনাদের অনুগ্রহভিখারী, তাহাত কাহারও অবিদিত নাই, আমিও না জানি এমন নহে, তবে আর বলিয়া মুখ ব্যথা করিয়া লাভ!"

রমেশ ব্যথিত হইয়া উঠিল, নম্র অথচ কোমল কণ্ঠে বলিল—"বৃথাই আপনি আমায় অপরাধী করিতেছেন।" বলিয়া একবার থামিল, একটা ঢোক গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"যাক্ সে কথা, আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। আমি জানিতে আসিয়াছি, যোগেশের সঙ্গে বিবাহে আপনার মত আছে কি না?"

রমেশ লাল হইয়া উঠিল, পীড়িত হৃদয়ে কমলার উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু উত্তর ত পাইল না, একটা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও না। ঘরে যে দ্বিতীয় মানুষ আছে, এমনটাও সে বুঝিতে পারিল না। অতিকষ্টে আবারও বলিল—"তাহার হাতে পড়িলে আপনিও সুখী হইবেন, সেও ভাগ্য মনে করিবে।"

অতিকষ্টে কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনের গতি ঠিক ছিল না, দেহও যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, এই অযাচিত ভিক্ষার জন্য ছমাস পূর্ব্বে ত সে রমেশের দোরে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। এক পা

বাড়াইতেই রমেশ আকুলকণ্ঠে বলিল—"যাবেন না, আপনার মতা-মতটা আমাকে আজই জানিতে হইবে।"

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ কি বলিতে গিয়া আলুথালু হইয়া বসিয়া পড়িল, মনের কথা মুখেই রহিল, মৃত পিতার উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—"পিতা আশীর্ব্বাদ কর, বল দাও, এত কষ্ট যে সহ্য করিতে পারিব, তাহাত কোনদিনও ভাবি নাই, তোমার আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর যে এক দণ্ডও বাঁচিতে পারিব না।"

রমেশও কুণ্ঠিতস্বরে বলিল—"আপনাকে হয়ত কষ্ট দিতেছি, কিন্তু সবত জানেন, জানিয়া শুনিয়া আমাকে অপরাধী করিবেন না।"

আবার ঐ কথা, কমলা কে, এই সংসারের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি, নিরাশ্রয়া বলিয়া দয়া করিয়াইত ইহারা কমলাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তবে আর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বিরূপ বিদ্রূপে তাহাকে পীড়ন করিবার উদ্দেশ্য কি! উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট শব্দের জড়িত বন্ধন ছিন্ন করিয়া বলিয়া উঠিল—"আবার ঐ কথা, দয়া করিয়া যদি আশ্রয়ই দিয়াছেন, তবে আর বার বার আমাকে এমন ভাবে সে কথাটা মনে করিয়া না দিলেও চলিতে পারে।"

রমেশ বলিল—"ঐ দেখুন, আপনি কথায় কথায় কেমন ভুল করিতেছেন, সবই যদি দোষ বলিয়া মনে করেন ত, আমি নিরুপায়—"

কমলা বাধা দিল, জোর দিয়া বলিল—"কথা এই যে আমার জন্যে আপনাকে ভাবিতে হইবে না, বন্ধুবান্ধবের কাছে হাত কচ্লাইতেও হইবে না, আমি বেশ আছি।"

"হাত কচ্লাইতে কেন যাইব? বলিয়াছিত, যোগেশ আপনাকে পাইলে ভাগ্য মনে করিবে।"

"ভাগ্য যে মনে করিবে, সেটা আপনাদের ভার হইয়াই বুঝিতে পারিয়াছি।" বলিয়া কমলা থামিল, একটু ভাবিয়া আবার বলিল—"সহসা কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া ভাগ্য প্রসন্ন করিব, সে শক্তি বা সাহস আমার নাই!"

রমেশের বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সাদাসিধা মেয়েটি যে সংসারের পেষণে পিষ্ট হইয়া দুইদিনেই এতবড় পাকা হইয়া উঠিয়াছে, তাহাত তাহার মনেরও অগোচর ছিল। এবার সে গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল—"সে কথা বলিলেত চলিবে না, বিবাহ যে আপনাকে করিতেই হইবে।"

ছোট্ট কথায় কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"আর যদি নাই করি।"

"সে কি করিয়া হইবে?" "যেমন করিয়া আপনার হইতেছে।"

বলিয়া রমেশের সমস্ত মুখ কালি করিয়া দিল।

রমেশ বলিল—"আমার কথা ছাড়িয়া দিন, আমিত গোল্লায় যাইতে বসিয়াছি। তা বলিয়া মেয়েদের ত সে পথ বরণ করিয়া লইলে চলিবে না। জাতিধর্ম্মত রক্ষা করিতে হইবে।"

কমলা কঠিন হইয়া উঠিল বলিল—"তর্ক আমি করিতে চাই না, আপনাকে বিরক্ত করিবার ইচ্ছাও আমার নাই, এই কথাটিই জিজ্ঞাসা করি রমেশবাবু, জাতি ধর্ম্ম বলিয়া যে জিনিষগুলি রহিয়াছে, সে গুলো কি মাত্র মেয়েদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।"

"তার মানে"—বলিয়া বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া রমেশ কমলার ম্লান মুখের দিকে চাহিল।

কমলা ঢোক গিলিল, লজ্জা ভয় দূর করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল—"পুরুষের জাতিও জায় না, ধর্ম্মও জায় না। কেন এ সব কি তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি, যে যাহাই করুক, তাহাদের ইচ্ছার দড়ি গলায় বাঁধিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেই হইবে! ইচ্ছামত না হইলে পুরুষ বিবাহ করিবে না, পিতার বাক্য অবহেলা করিবে, গুরুজনের অন্তিম আদেশ ঘাড়ে করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে। ধর্ম্মও যাইবে না, জাতিও বজায় থাকিবে। তবে আমাদের উপরেই বা এত জোর জুলুম কেন? পুরুষের স্বেচ্ছাচারের দড়ি নাকে পড়িয়া আমরা ঘানি গাছে ঘুরিব, এমন কি দায়, মেয়েদের যে প্রাণ নাই, একথা হয়ত আপনারা স্বীকার করিতে পারেন, আমি পারিলাম না।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া কমলা হাপাইতে লাগিল। অনেকদিনের বোঝা করা জঞ্জালগুলি যেন ভাঁড়ার হইতে দূর করিয়া দিয়া আপনাকে অনেকটা মুক্ত হাল্কা মনে করিল। যে উপেক্ষাটাকে সে বরণ করিয়া লইতেছিল, আজ

যেন সেটাই তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার মুখ দিয়া এত-গুলি কথা বাহির করিয়া দিল। রমেশের নিষ্ঠুর আচরণে সে যে দগ্ধ হইতেছিল, আজ তাহা রমেশকে বাদ দিল না, পোড়াইয়া মারিবার জন্য জ্বলিত লোহ ব্যগ্র হইয়া রমেশের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল।

রমেশ থমকিয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল—"এ আপনার যথার্থ কথা, তবু যাহা রীতি;—"

কমলা বাধা দিল, কঠিন কণ্ঠে বলিল—"রীতি যদি সবারই জন্য না হয়ত, আমিও তাহার অন্যথা করিব। এ দুর্ভাগ্য দেশে এখন এমনটারই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আঘাতের উপর দ্বিগুণ আঘাত করিয়া তবে লোকশিক্ষা দিতে হইবে। জোর জুলুম আর খাটিবে না। সকল বিষয়ে পুরুষের ইচ্ছা বলবতী হয় দোষ নাই, জীবন মন সপিয়া চিরদিনের জন্য যে ফাসি গলায় পরিতে হইবে; তাহার জন্য আমরাও একবার ভাবিয়া দেখিব; মনোমত পাত্র জোটে মেয়েদের বিবাহ হইবে; নয়ত তারাও চিরকুমারী থাকিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে। আর জাতিধর্ম্মের কথা যাহা বলিতেছেন, আমার ন্যায় অনাথিনীর জাতি বা ধর্ম্মের জন্যত কাহারও মাথা ব্যথা হইবে না।"

রমেশ নিশ্চল নীরব। প্রায় পনর মিনিট জড়ের মত থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"তবু আমাদের কর্ত্তব্য করিতে হইবে। আপনার পিতা—"

"দায়ে ফেলিয়া গিয়াছেন। তিনি ভুল করিয়া গিয়াছেন, আমি সে ভুল সারিয়া লইব; আপনাদিগকে মুক্তি দিব।" বলিয়া কমলা কাপড়ের আচলে চোখ মুছিল; এই যুদ্ধে তাহার স্ত্রীহৃদয় যেন ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল। কাটা ঘায়ে লবণ পূরিয়া দিলে মানুষ যেমন ছটফট করে, তেমনি করিয়া উঠিয়া কমলা বলিল—"ওঃ, মানুষ এতও নিষ্ঠুর হইতে পারে।" কমলা আবার থামিল, বাণবিদ্ধা হরিণীর মত আপনাকে অসহায় জানিয়া সে মনে বল আনিল, বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"কর্ত্তব্য করিতে ত আপনারা ত্রুটি করেন নাই রমেশবাবু; পথে পড়িয়াছিলাম; কুড়াইয়া আনিয়া দুমুঠা খাইতে দিতেছেন; আজকালের দিনে এই যথেষ্ট। পিতার অন্তিম অনুরোধ মনে করিয়া আমাকে যে আপনি এ বাড়ীতে থাকিতে দিতেছেন, এজন্যই আপনাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না।"

বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না; পর্ব্বতসানুবাহী নির্ঝরিণীর ন্যায় লাকাদা বুকে করিয়া কাঁটার আচড়ে রক্তাক্ত দেহে ধীর মন্থর-গতিতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার বুকে করিয়া রমেশ মৃতের মত অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

[২০]

ইন্দুমাধব রমেশকে ডাকিয়া বলিলেন—“বাবা রমেশ, আমার বয়েষ হইয়াছে, আজ আছি ত, কাল নাই, কথাটা রাখ, পিতার শেষ অনুরোধ অমান্য করিও না।”

রমেশ মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে রহিল, তাহার কাণে যেন কথাটা পৌঁছায় নাই, ইন্দুমাধব আবার বলিলেন—“কমলাকে বিবাহ না করিলে বড় পাপ হইবে রমেশ, মোহিনী যে বিশ্বাস করিয়া তোমার হাতেই তাহাকে তুলিয়া দিয়াগিয়াছে। মৃতের অভিশাপ কুড়াইও না, কমলার চোখে জল দেখিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না।”

রমেশের শরীরে পুলক জাগিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল—“অমঙ্গল যেটুকু বাকি রহিয়াছে, তাহাইত আমি চাই, চরম অমঙ্গল মরণ যদি হইত ত এ যাত্রার মত বাঁচিয়া যাইতাম।” প্রকাশ্যে বলিল—“দেখ বাবা, যে কথা আমি রাখিতে পারিব না, সেই কথাটাই পুনঃ পুনঃ বলিয়া আমাকে অপরাধী করিও না। যোগেশকে বল, তাহার সহিত কমলার বিবাহ দিয়া দাও।”

“তুমিই যদি কথা না শুনিলে ত যোগেশ শুনিতে যাইবে কেন? আমার কথাটা যে তাহার কাছে, উপেক্ষিতের করুণ আবেদন হইবে।”

“তাকেও ত তুমি স্নেহ কর, তোমার কথা সে ফেলিতে পারিবে না।”

ইন্দুমাধব কঠোর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমিও জানি বিবাহে তাহার রুচি নাই, অন্যায় অনুরোধ করিব এমন কি অধিকার আমার আছে। তোমাকেই বিবাহ করিতে হইবে রমেশ, এ আমার অনুরোধ নহে, আদেশ।"

রমেশের পিঠে চাবুক পড়িতেছিল, আশা থাকুক, আর নাই থাকুক, আদেশই হউক, অনুরোধই হউক, খেয়াল সে ত্যাগ করিতে পারে না, আর একবার পিতার আদেশ পালন করিতে গিয়া সে যে পৃথিবীর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভুল একবার করিয়াই তাহার যে শাস্তি হইয়াছে, দ্বিতীয়বার ভুল করিবে কোন্ সাহসে। রমেশ মাথা উচু করিয়া বলিল—"বৃথা তর্ক আমি করিতে চাহি না, ইচ্ছা হয় আমায় তাড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু জোর জুলুম করিয়া কোনই ফল হইবে না!"

"অমঙ্গলকে ডাকিতে হয় না রমেশ, সে আপনি আসে, কমলাকে বিবাহ না করিলে আমি তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করিব।"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ বিষাদে বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিল, ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া এই স্নেহের পুত্রটির জন্য ইন্দুমাধবের প্রাণও লোটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, তবু তিনি গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিলেন না, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে পুত্রের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, রমেশ পিতার পায়ের ধুলা মাথায় লইল, বলিল—"তুমি আমায় বাঁচাইলে, মুক্ত করিয়া দিলে, আমি চলিলাম,

যেদিকে দুই চোখ যায় যাইব, পারি ত সময়ে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের কার্য্য করিব,' অভাগা অক্ষম পুত্রকে ক্ষমা করিও পিতা !"

কমলা গৃহে প্রবেশ করিল, রমেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"রমেশবাবু, আপনাকে কিন্তু আমার একটা কাজ করিতে হইবে, একটু পরিশ্রম আমার জন্য না করিলে ত চলিবে না।"

রমেশ ফিরিয়া চাহিল, কথাটা শুনিবার জন্য উতলা হইয়া উঠিল, যাইবার কালে যদি এই অনাথিনীর কোন একটি কাজও করিয়া যাইতে পারে। কমলা বলিল—"জানেন ত পিতার কার্য্য আমি কিছুই করিতে পারি নাই, একাদশী উপলক্ষে শ্রাদ্ধ করিব ঠিক করিয়াছি, এই নিন ব্যাঙ্কের খাতাখানা, টাকা উঠাইয়া আনিয়া যাহা কিছু দরকার আয়োজন করিয়া রাখিবেন।"

রমেশ নিরুপায়ের মত চাহিয়া রহিল, একদিন অপেক্ষা করিবার উপায়ও যে তাহার নাই। কমলা আবার বলিল—"বাপত ছেলেকে এমন কত কথাই বলিয়া থাকেন, তারি জন্যে নাকি মুখ ভার করিয়া ভাবিতে হয়!"

কমলার মন বলিতেছিল,—"তুমি আমার জন্য গৃহ ছাড়িয়া যাইবে, কেন, আমি কে, আজ আছিত কাল নাই। অধিকার যদি নাই দিলেত চিরকাল থাকিলেই বা তোমার কি ক্ষতি! বাড়ীর একটা সামান্য পরিচারিকার জন্য নাকি পিতার উপর অভিমান করিতে হয়! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, তোমাকে বাড়ী হইতে

তাড়াইয়াও আমি এখানে তিষ্ঠিতে পারিব না। দিনান্তে একবারও দেখিতে পাইলে আমি যে মরণ-যন্ত্রণাও সহ্য করিতে পারি।" মুখ তুলিয়া ইন্দুমাধববাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি বলিয়া দিন রমেশবাবুকে, আমার কাজটি সম্পূর্ণ না করিয়া উনি আর কোন কাজে যাইতে পারিবেন না।"

ইন্দুমাধব দুঃখিত স্বরে বলিলেন—"যে তাড়াইবে, সেই যখন যত্ন করিয়া ডাকিতেছে, তখন ত আমার এর মধ্যে কথা বলিবার সাধ্য নাই, কমলা যাহা বলে তাহাই কর রমেশ!"

রমেশ পুড়িয়া মরিতেছিল, এ অনুগ্রহদান যে জ্বলন্ত লৌহশলাকা হইয়া তাহার বক্ষের মধ্যে বিঁধিতেছে। সরযূ তুমি কি করিলে, কি কুহকে বুকের রত্ন ফেলিয়া দিয়া আমি বিষের অনুসন্ধানে চলিয়াছি, অমৃতের ভাণ্ড দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া অঞ্জলি পুরিয়া গরল মুখে করিতেছি। প্রকাশ্যে বলিল—"আপনার কার্য্য যাহাতে সম্পন্ন হয়, যোগেশকে বলিয়া আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব।"

"সে কি করিয়া হয় রমেশবাবু, অন্য কাহাকেও আমি বিশ্বাসই করিতে পারি না, আপনার কাছে হাতজোড় করিয়া বলিতেছি, চলিয়া গিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবেন না।"

রমেশ নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ, কমলা আবারও আঘাত করিয়া বলিল—"আমার জন্যে এতই করিয়াছেন ত এ কষ্টটুকু আপনাকে করিতেই হইবে।"

রমেশ আর কথা বলিতে পারিল না, হৃদয়ের মধ্যে যে জ্বালার সৃষ্টি হইয়াছিল, বাহিরে তাহার আভাসমাত্র প্রকাশ না করিয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কমলা বলিল—"আপনি আজ আর বাহিরে যাইতে পাইবেন না, আমি সমস্ত কাজ সারিয়া আসিয়াছি, রামায়ণ পড়িয়া শুনাইব।" বলিয়া রামায়ণ লইয়া সীতার বনবাস পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। পড়িতে পড়িতে যে চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, সে অনুভূতিও কমলার ছিল না। হঠাৎ তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, ইন্দুমাধব বিচলিত স্বরে বলিলেন—"কাঁদিতেছ মা?" আর একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, এই বন্ধুকন্যাটির জন্যে প্রাণের কোণে যে নিবিড় অন্ধকার জমাট পাকাইতেছিল, কালবৈশাখীর মেঘের মত তাহা আজ যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিল। কমলা শীঘ্রহস্তে অঞ্চলে চক্ষু মুছিল, কাতরকণ্ঠে বলিল—"আমি অন্যায় করিয়াছি, আপনি যেন এজন্য মনে কষ্ট করিবেন না।"

ইন্দুমাধব উত্তর করিলেন—"তুমি এত ভাবিও না মা, আমি তোমার একটা উপায় করিব, তবে ছাড়িব।"

[২১]

যোগেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া লজ্জিতভাবে জড়সড় হইয়া এক পাশে দাঁড়াইল, কমলা অঞ্চল টানিয়া মাথায় দিল, মনকে

রামায়ণের পাতার আড়ালে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া রহিল। সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখখানা নিমেষের মধ্যে দেখিয়া যোগেশ মুখ ফিরাইয়া লইল, এই মুহূর্ত্তের দৃষ্টি যেন তাহার মনে কেমন একটা বিশ্রী বেয়াড়া আঘাত করিল, লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন ?"

"হা বাবা !" বলিয়া ইন্দুমাধব যোগেশকে চৌকিটার যে দিকে কমলা বসিয়াছিল, সে দিক্‌টা দেখাইয়া বলিলেন,—"বস বাবা !"

যোগেশ বসিল না, আর একবার কমলার মুখের উপর সঙ্কুচিত দৃষ্টিপাত করিয়া সে যেন সহসা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে তাহার মনের বেগ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল; যোগেশ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না, একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাস অকারণ তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল, যোগেশের দৃষ্টির সঙ্গে কমলার দৃষ্টি মিলাইয়া গেল, কমলা মাথা নামাইয়া লইল, যোগেশ মরিল, তৃষিতের মত দেখিতে লাগিল, ভরা নদীতে যেন ঢেউ খেলিতেছে, সান্ধ্য ছায়া-পাতে রঞ্জিত গঙ্গাবক্ষের ন্যায় কমলার আরক্ত মুখখানা কত সুন্দর, বিধাতা যেন নির্ম্মাণ-কৌশলের সীমারেখা সে মুখের উপর টানিয়া দিয়াছেন। আর একবারও যোগেশ কমলাকে দেখিয়াছিল, কিন্তু সেবারত সে এত রূপ দেখে নাই। যোগেশের হৃদয় যেন সৌন্দর্য্য-দর্শনের আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিল, কমলার সৌন্দর্য্য জ্যোৎস্না-

প্রলেপের মত, শারদ শশাঙ্কের মত, পুষ্পশ্রীর যৌবনলীলার মত, বসন্তে পুষ্পিত পল্লবিত অরণ্যলক্ষ্মীর স্মিত হাস্যের মত, স্বচ্ছ জলের কোলে প্রস্ফুটিত কমলের মত যোগেশের দুঃখাভিহত জীবনের মধ্যে একটা নবরাগিণী আনিয়া দিল, তাহার অন্তরের অভ্যন্তরে সুপ্ত যৌবনটি যেন সহসা জাগিয়া উঠিল, অন্ধকার কাটিয়া আলো দেখা দিল। ইন্দুমাধববাবু বলিলেন—"বাবা যোগেশ, তোমায়ত আমি রমেশের মতই মনে করি, তুমি আমার অনুরোধ রাখিবে, এই মেয়েটির ভার তোমায় নিতে হইবে।"

বসন্তের বনশ্রী ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিল, পূর্ণিমার রাত্রি শ্বেত জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে, আকাশের গায়ে তারার হার মনোরম শোভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, কোকিলের স্বরের মত আজ এই বৃদ্ধ ইন্দুমাধববাবুর স্বরটা যোগেশের সমস্ত মনের উপর মৃদু মৃদু টিপ দিতেছিল। বুক দুরু দুরু কাঁপিতেছিল, সে উত্তর করিতে পারিল না, মুখ ঘুরাইয়া কমলার মুখের পরই দৃষ্টি করিল, যোগেশ ছিট্‌কাইয়া এক পা সরিয়া গেল, বসন্ত কাটিয়া দারুণ গ্রীষ্ম দেখা দিল, নিদাঘের তাপে ফলপাতা ঝরিয়া বৃক্ষ ডাটাসার হইয়া উঠিয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি যোগেশের মনের অলিগলি শুদ্ধ আঁধার করিয়া দিল, আলো নিভিল, মেঘের কোনে তারা লুকাইয়া গেল, যোগেশ দেখিল, সে দৃষ্টি প্রার্থনার পরিবর্ত্তে উপেক্ষা পরিপূর্ণ, এতে যে করুণ

মিনতি রহিয়াছে, তাহা যেন তাহাকে দূরে থাকিতেই উপরোধ করিতেছে। যোগেশের মোহের ঘোরটা কাটিয়া আসিতেছিল, নেশার পিঠে চাবুক মারিয়া কর্ত্তব্য যেন তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল, তাহার মনে পড়িল, কমলাকে ত তাহার পিতা রমেশের হাতে সঁপিয়া গিয়াছেন, রমেশ তাহার জিনিষ গ্রহণ না করিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু কমলা কি করিয়া অন্যের হইবে? বুভুক্ষিত উদরের জ্বালাটা মুহূর্ত্তে লঘু করিয়া লইয়া যোগেশ উত্তর করিল—"আপনিত জানেন, আমি বিবাহ করিব না স্থির করিয়াছি।"

ইন্দুমাধব গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"একটা খেয়ালকে চাপিয়া ধরিতে গিয়া সম্মুখের কর্ত্তব্যরাশিকে ছুড়িয়া ফেলিও না, বাপপিতাম' যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তুমিই বা তাহা না করিবে কেন?"

যোগেশ মস্তক নত করিল, অতিকষ্টে লুব্ধ দৃষ্টি তুলিয়া আর একবার কমলার মুখের দিকে চাহিল, আশ্বস্ত হইতে পারিল না। তাহার অন্তরাত্মা ভীত হইল, বলিল—"আপনি রমেশদাকে জোর করিয়া বলিলে সেই রাজি হইবে।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে কমলা যোগেশের দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ইন্দুমাধব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ঐ দেখ তোমাদের কেমন বুদ্ধি, যেও না মা, তোমায় যে এখানে থাকিতে হইবে।"

অন্তি অনিচ্ছায় কমলা বসিয়া পড়িল, ইন্দুমাধব যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"উপদেশ দিতে তোমরা কেউ কম নও। আমি যে বুড় হইয়াছি, তোমাদের মত উচ্চ শিক্ষিত ছেলেদের উদার উপাদেয় উপদেশ হজম করিব, এত অগ্নিত আজ আর আমার উদরে নাই।"

যোগেশ লজ্জিত হইল, তাহার অন্তর পুলকে নাচিয়া উঠিল, কমলার প্রশংসমান দৃষ্টিটা যেন হৃদয়ের অঙ্কে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মাতোয়ারা করিয়া তুলিল, প্রলোভন কর্ত্তব্যকে ছাপাইয়া উঠিল, সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কমলা কি এতে রাজি হইবে ?"

দৃষ্টি ফিরাইতেই কমলার দৃষ্টির সহিত মিলিয়া গেল, দেখিল, প্রশংসার পরিবর্ত্তে ঘৃণা স্ফুরিত হইতেছে, কমলার রক্ত চোখ নিরুপায়ে পড়িয়া বিরক্তিতে ঘৃণায় ক্ষোভে ছুটিয়া পড়িতেছে। তাহার সেই সতেজ ম্লান দৃষ্টি যেন পুনঃপুনঃ নিষেধে যোগেশকে তাড়া করিতেছিল। যোগেশ মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দুমাধবের উত্তরের পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল—"না না, সে হতেই পারে না, কমলা কেন স্বীকার করিতে যাইবে ?"

ইন্দুমাধব জোর দিয়া বলিলেন—"সে চিন্তা তোমায় করিতে হইবে না যোগেশ, তুমি স্বীকার করিলেই বাঁচি ; আমার মা কখনও ছেলের কথার অন্যথা করিবে না।"

কমলা জড়ের মত নিশ্চল, মুখ শুকাইয়া আসিতেছিল, বুক কাঁপিতেছিল, কথা জড়াইয়া গিয়া বাহিরে বাহির হইবার শক্তি হারা হইয়া পড়িয়াছে। ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসে সমুন্নত বক্ষ কাপিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। যোগেশ লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই নয়নমনোরম, সৌন্দর্য্যকলার আদর্শ, শীরিষের মত কোমল, বসন্ত কোকিলের কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর, অমৃতের ন্যায় স্বাদু, পুণ্য তীর্থের মত পবিত্র, বীণার মৃদুঝঙ্কারের মত শ্রবণমনোহারী হৃদয়ের আনন্দোৎসব কমলার বাহুবল্লীর গাঢ় আলিঙ্গনের কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিল, তাহার ভাষাভাব যেন শূন্যপথে বিচরণ করিয়া তাহাকে অপ্সরোবেষ্টিত নয়নানন্দ নন্দনকাননে আনিয়া উপস্থিত করিল, কে যেন পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণার কথা ভুলাইয়া দিয়া কর্ত্তব্যদৃঢ় মনকে দোলায়িত করিয়া কিশলয়রক্ত কমলার অধর-রস পানের জন্য তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল, একটা হাঁ'র উপর তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের সুখসম্পদ্ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, সে আর ভাবিল না, কর্ত্তব্যকে দূরে ঠেলিয়া হাতের রত্ন গলায় পরিবার জন্য ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আপনার আদেশ পালন করিব, কমলাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলাম।"

ইন্দুমাধব শোয়াস্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"বাঁচিলাম, বিবাহটা যাহাতে শীঘ্র হইতে পারে, আমি সে বন্দোবস্ত করিব।"

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অশনিধ্বনি কমলার শ্রবণশক্তি

রৌদ্র করিয়া দিল, ব্যাধজালবদ্ধা হরিণীর মত কমলা কাতর মিনতি পূর্ণ নিশ্চল দৃষ্টিতে যোগেশের দিকে তাকাইয়া যেন করুণা ভিক্ষা করিতেছে। এ দৃষ্টির অর্থ যোগেশ না বুঝিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মন তাহাকে সাহস দিল, অন্য পথে টানিয়া লইয়া চলিল, সে বলিল—"মানসিক দুর্ব্বলতা দুদিনে সারিয়া যাইবে।" মুহূর্ত্তে কমলা তাহার অত্যজ্যা হইয়া উঠিল, সে আর একবার পিপাসিত দৃষ্টিতে বর্ষার ভরা নদীর মত উচ্ছ্বাসিতযৌবনা কমলার দিকে সস্পৃহ দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া অতি অনিচ্ছায় বাহিরে পা বাড়াইল।

কমলা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বাবা, আশ্রয় দিয়াছ ত ত্যাগ করিও না। পায়ে রাখ, এ আমি প্রাণ থাকিতে পারিব না।"

যোগেশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, লজ্জায় তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল, আত্মহারা হইবার জন্য লুব্ধ অন্তরকে ধিক্কার দিল, মনের উপর কে যেন কণ্টক বিঁধিয়া দিতেছিল, পুরুষের এত দুর্ব্বলতা, এত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, দৃষ্টিমাত্রে জীবনের সকল উদ্দেশ্য ভাসাইয়া দিয়া, পরের সুখদুঃখ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলাইয়া এ যে ব্যাধির ন্যায় মোহের আক্রমণ। মনে মনে বলিল—"কমলত সব জলে ফোটে না, সে যে দুর্ল্লভ রত্ন, আমার যে বামন হইয়া চন্দ্র গ্রহণের প্রয়াস, মূর্খ আমি না বুঝিয়া দেবতার মনে কষ্ট দিতে আসিয়াছি, দেবভোগ্য

বস্তুতে কুক্কুরের স্পৃহা!" প্রকাশ্যে ইন্দুমাধবকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"ভাবিয়া দেখিলাম, বিবাহ আমি করিতে পারিব না, আমায় আপনি ক্ষমা করিবেন। কমলার জন্য রমেশদাকে অনুরোধ করিব।" বলিয়াই সে অভিসপ্ত সন্তানের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বৃদ্ধ ইন্দুমাধবের বুক ফাটিয়া যোগেশ ও কমলার জন্য দুই দুইটা দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইল।

[২২]

ভোরে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার কালে সুশীলা সরযূকে বলিলেন—"চল মা, স্নান করিয়া আসি।"

সরযূ পাশ ফিরিয়া শুইল, বলিল—"এত সকালে স্নান করিলে আমার শরীর খারাপ হইবে, তুমিই যাও মা!" বলিয়া চক্ষু বুজিল।

সুশীলা রতনকে ডাকিয়া বলিলেন—"রতন, যাত বোসেদের বাগান হইতে যদি কটা ফুল আনিতে পারিস, সরযূ শিবপূজা লইবে, কেনা ফুলে ত হইবে না।"

সরযূ মার অঞ্চল ধরিল, বলিল—"আচ্ছা মা, এত তাড়াহুড়ই কেন?"

সুশীলা অবাক্ হইয়া কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন,

সরযূ বলিল—"আমি পারব না, তুমি ভট্‌চাজ মশায়কে বারণ করিয়া দাও, শিবপূজা এখন থাক।"

সরযূর এই খামখেয়ালিতে সুশীলার গম্ভীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিত, ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে তাহার সাহসে কুলায় না, কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও অপরাধ বাড়িয়া যায়, অল্প-দিনেই সুশীলার প্রাণটা যেন খাবি খাইয়া উঠিতেছে। অগ্রগমনে কন্যার দুঃখ, ফিরিয়া দাঁড়াইলে হিন্দুবিধবার আচার-অপালনে প্রত্যবায়, কাজেই ভবিষ্যৎ দুঃখ, ধীরে সরযূর হাত ধরিয়া বলিলেন—"সে কি করিয়া হইবে মা, আমি যে সব আয়োজন করিয়াছি।"

"এর জন্য এতই কি আয়োজন করিতে হইয়াছে যে, না হইলেই ফেলিয়া দিতে হইবে" বলিয়া সরযূ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বসিল।

সুশীলা বলিলেন—"যাই স্নান করিয়া আসি, সকাল যে হইয়া আসিল।" বাহিরে আসিয়া রতনকে ডাকিয়া বলিলেন—"কাজ নাইরে তোর ফুলের জন্য গিয়া, রোজ যে ফুল আসে তাহাতেই হইবে, রতন, চলত আমার সঙ্গে ঘড়াটা লইয়া, এক কলসী গঙ্গাজল লইয়া আসিবে, আর দেখ, কাপড়খানা কিন্তু সঙ্গে নিও, স্নান করিয়া আসিতে হইবে।"

বেলা দশটা পর্য্যন্ত সুশীলার সাড়া পাওয়া গেল না, স্নান করিয়া সেই যে তিনি ঠাকুরঘরে ঢুকিয়াছিলেন, আর বাহির

হইবার নামটি নাই। সরযূ ছট্‌ফট্‌ করিয়া এ-ঘর সে-ঘর করিতে-ছিল, সকালে মায়ের বুকে যে আঘাতটা করিয়াছিল, বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও যেন বাড়িয়া উঠিয়া সরযূর বুকেই ফিরিয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে ত সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে মায়ের মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতেও সাহস পাইত না, হঠাৎ এমনটা কেন হইল, অনিচ্ছায় হইলেও প্রতিকথায় প্রতিকার্য্যেই মাতাকে আঘাত করিয়া ছাড়িতেছে, সরযূর চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, পূজার ঘরের দোরে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"মা!"

সুশীলা উত্তর না করিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিলেন, সরযূ বসিল না, বাহিরে আসিয়া রতনকে ডাকিয়া বলিল—"রতন, যাত, শিগ্‌গির করিয়া একটা গাড়ী ডাকিয়া আন।"

রতন বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রইলি, সরযূ ধমক্ দিয়া বলিল—"বড় হাবার মত দাঁড়াইয়া রহিলি যে, শিগ্‌গির গাড়ি ডাকিয়া আন, বেলা অনেক হইয়াছে।"

দূর হইতে মাতাকে নমস্কার করিয়া সরযূ গাড়ীতে উঠিল, মনে মনে বলিল—"পারিত প্রাণ দিয়াও তোমায় সন্তুষ্ট করিব মা।"

মস্ত পুটুলি হস্তে গাড়ী হইতে নামিয়া পুরোহিত মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিল—"আজই শিবপূজা লইতে আসিয়াছি?"

পুরোহিত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তা বেশত, তুমি বস, আমি আয়োজন সারিয়া নি।"

"আপনাকে কেন কষ্ট করিতে হইবে, প্রয়োজনের প্রায় সকলই আমি আনিয়াছি, কিছু বাদ যদি পরিয়া থাকে, বলিয়া দিন, রতন আনিয়া দিবে।"

শিবমন্ত্র গ্রহণ করিয়া গরদের কাপড় পরিয়া বেলা তিনটায় সরযূ আসিয়া মাতাকে নমস্কার করিল। সুশীলার চোখের জল বাধা মানিল না, উষ্ণ অশ্রুর আঘাতে সরযূ চমকিয়া উঠিল, মুখ তুলিয়া বলিল—"তুমি কাঁদিতেছ, বলত কি করিলে তোমার চোখে জল না দেখিয়া থাকিতে পারি!"

জল এবার প্রবলবেগে দেখা দিল, সরযূ জোর করিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইল, মাতাকে আকুল করিয়া দিয়া বলিল—"বেলাত তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় যে নাড়ী জ্বলিয়া গেল, চল মা খাইতে দিবে।"

সুশীলা চোখ মুছিলেন, কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন—"চল মা, মায়ের উপর রাগ করিয়া নাকি এত কঠোর হইতে হয়!"

রাত্রির আহ্নিক সারিয়া সরযূ তাহার নিজের ঘরে বসিয়া পুস্তকের সাহায্যে শিবপূজা শিখিতেছিল, রমেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সরযূ মা কৈ রে!"

সরযূ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—"এসনা রমেশদা, দুদণ্ড বসিয়া যে গল্প করিব, এমন লোকও ত আমার নাই।"

রমেশ বসিল, উৎকণ্ঠিত চিত্তকে কথার আড়ালে ঢাকিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কি পড়িতেছ সরযূ?"

"শিবপূজা শিখিতেছি, আমার যে আজ শিবপূজা লইতে হইল!"

হঠাৎ সরযূর হাতের উপর দৃষ্টি পড়িতেই রমেশ চমকিয়া উঠিল, অসংযত আবেগটা বাহির হইয়া আসিল, মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া এক সময়ে বলিল—'আংটিটা আমায় ফিরাইয়া দাও।"

চুলের আগা হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ঝাকানি দিয়া কাঁপিয়া শান্ত হইল, সরযূ অধোমুখে বসিয়া রহিল। রমেশ স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"আর কারুর হাতেত ওর স্থান হইবে না। আমার জিনিষ আমার হাতেই আসিবে। যেখানে অধিকারের দাবী রহিয়াছে, সেখানে জোর জুলুম চলে ক'দিনের তরে!"

ঢোক গিলিয়া স্বরটা সহজ করিয়া লইয়া সরযূ উত্তর করিল—"লোভকে আস্কারা দিওনা রমেশদা, লাই পাইলে সে যে মাথা চাপিয়া বসিবে। এতই যদি ত্যাগ করিতে পারিয়াছ ত এটুকুও পারিবে। এ শেষ স্মৃতি আমি মরণ পর্য্যন্ত ধারণ করিব।"

"ত্যাগ ত ইচ্ছা করিয়া করি নাই সরু, দস্যুতস্কর বুকের রক্ত ছিনাইয়া কাড়িয়া লইয়াছে, অভাবে বুক পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, ফিরিয়া পাইত বুকে ধরিয়া জ্বালা জুড়াই।"

অঙ্গুরীয়টি জোরে চাপিয়া ধরিয়া সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর করিল—"এ সব কি কথা রমেশদা, কোথায় তুমি আমায় সান্ত্বনা দিবে, সদুপদেশে বুকে বল আনিব। তা না করিয়া এ কি তোমার উপযুক্ত হইতেছে। বুক চিরিয়া রক্ত দিতে গিয়া দুই হাতে বুক জড়াইয়া ধরিলে ত চলিবে না।"

"সান্ত্বনা,—কোথায় পাইব সরযূ? নিজেকে বাঁচাইয়া তবে মানুষ পরের কথা ভাবে। ঐ একটি জিনিষের অভাবে যে আমারই হাড় শুদ্ধ বসিয়া গিয়াছে। এত বড় পৃথিবী এতে রমেশের স্থান নাই। পিতা তাড়াইয়া দিয়াছেন, মাটির ভাণ্ড পাইয়া তুমিও অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিতেছ।"

সরযূর স্বর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের গোপন ভাবটা দুর্ব্বল তার মুখে প্রকাশ হইবার ভয়ে জড়িত কণ্ঠে স্খলিত স্বরে বলিল—"এ সকল কথা শুনাইবার জন্যই কি যখন তখন আসিয়া হাজির হও রমেশদা! আত্মাকে বঞ্চনা করা যদি এতই শক্ত হয় ত, পথ দেখ, ঘরে ঢুকিয়া গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিও না।"

রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কি বলিতে গিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। ঠিক মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া সুশীলা অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"তোমাকে না আমি ডাকিয়া পাঠাইয়াছি রমেশ?"

পরদিন সকালে সরযূকে ডাকিয়া সুশীলা বলিলেন—"তুমি প্রস্তুত হইয়া লও সরযূ, আজই আমরা দেশে যাইব।"

ভাদ্রমাসের শেষে একবার করিয়া সুশীলা দেশে যাইতেন।

দেশের বাড়ীতে গরিবানাভাবে মহামায়ার পায়ে অঞ্জলি দিয়া পূজার পরে আবার কলিকাতায় ফিরিতেন। শ্রাবণ মাস পড়িতেই তাঁহার দেশে যাওয়ার প্রস্তাবে সরযূর মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এখন দেশে যাইবে, কেন মা?"

"এবার সময় থাকিতে না গেলে হইবে না, টাকা পয়সার অবস্থাত জান, গোড়া হইতে চেষ্টা করিয়া যাতে দুপয়সা কম লাগে, তাহাই করিতে হইবে।"

ভূয়া কথায় সরযূর মন প্রবোধ মানিল না। সে বলিল—"এত দিন ধরিয়া দেশে বাস করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকিব।"

"সে কি মা, তোকে একা রাখিয়া নাকি যাইতে পারি।"

"একা কেন রাখিতে যাইবে, রতন রহিয়াছে, আমি বেশ থাকিতে পারিব।"

নিরুপায়ে পড়িয়া সুশীলা হাপাইয়া উঠিতেছিলেন। সরযূ জোর দিয়া বলিল—"বিধাতার ইচ্ছা, আমার ভার আমিই লইব মা!"

সুশীলা শুষ্ক মুখে উঠিয়া গেলেন, তাঁহার মন কিন্তু প্রবোধ মানিল না, ঘণ্টাখানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"সরয যাত মা, আহ্নিকের আয়োজনটা সারিয়া রাখ।"

অতি অনিচ্ছায় সরযূ উঠিয়া গেল, মায়ের সতর্ক দৃষ্টি তাহার

হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া দিল, কাল কেমন করিয়া রমেশকে তাড়াইলেন, সকাল হইতেই বাড়ী যাইবার কথা পাড়িতে আসিলেন। সরযূর মনের মধ্যে একথাগুলি ঘোট পাকাইতেছিল। মাটির শিবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করিবার জন্য তাহার তৃষিত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

[২৩]

দ্বিপ্রহরে আহারের পর সুশীলা ঘরের মেঝেতে বসিয়া শান্তি-শতক পাঠ করিতেছিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্র পৃথিবীর বক্ষে তাণ্ডব নৃত্যে খাঁ খাঁ করিতেছে। উত্তপ্ত বায়ু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ধূলিকণা বহন করিয়া আনিয়া জানালার গরাদে ঠেকিয়া ছিট্‌কাইয়া যাইতেছিল। রমেশ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আরক্ত নেত্রে প্রবেশ করিয়া সুশীলার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িল। কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"মা, বিবাহই করিব ঠিক করিলাম।"

সুশীলা টানিয়া আনিয়া রমেশের মাথা ক্রোড়ে লইলেন। সস্নেহে চুলের মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—"তাই কর বাবা, বৃদ্ধ পিতাকে আর কষ্ট দিও না। কমলাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে।"

পিতার নামে রমেশের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাঁহারই খেয়ালে যে কষ্ট সে ঘাড় পাতিয়া লইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইতে

হইলে কমলাকে বিবাহ করা চলে না। নির্ব্বন্ধের সহিত বলিল—"কমলাকে কিন্তু বিবাহ করিতে পারিব না, তুমি অন্য চেষ্টা দেখ মা।"

রমেশের শুষ্ক মুখের উপর বিস্ময়োজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সুশীলা বলিলেন—"সে কি? কমলা যে তোমারই পথ চাহিয়া রহিয়াছে।"

"যোগেশের সঙ্গে কমলার বিবাহ হইবার প্রস্তাব চলিতেছে।"

"সে হতেই পারে না রমেশ, আমি যতটা শুনিয়াছি, তাহাতে কমলা অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে, এমন ত মনে হয় না। এতটাই যদি পারিয়াছ ত, মার অনুরোধ রাখ, কমলাকে বিবাহ করিতেই স্বীকার কর।"

সুশীলার ক্রোড়ে নিবীড় বেষ্টন অনুভব করিয়া রমেশ অস্ফুটস্বরে বলিল—"তাহাই হইবে, তোমার কথাই রাখিব।"

গ্রীষ্মের বেগটা কমিয়া আসিলে রমেশ হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, সুশীলা একথালা মিষ্টি ও ফল আনিয়া বলিলেন—"অনেক দিন আমার এখানে কিছু খাওনি রমেশ, আজ কিন্তু তোমাকে সবটা খাইতে হইবে।"

রমেশ দ্বিরুক্তি করিল না, যেন শেষ খাওয়া খাইতে বসিয়াছিল, এক শ্বাসে থালাটা উজাড় করিয়া দিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"দেখ চিহ্নমাত্র যদি রাখিয়া থাকি।"

"এবার চল রমেশ, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, যাহাতে বিবাহটা শীঘ্র হইতে পারে, তোমার পিতাকে সে কথাই বলিয়া আসিব।"

রমেশ চঞ্চল হইয়া বলিল—"না না, তুমি কেন বলিতে যাইবে, বিবাহই যদি করিতে পারি, বলিতে আর পারিব না।"

সুশীলা হাত ধরিলেন, বলিলেন—"আবার পারি কেন বাপ, সবত ঠিক হইয়া গেল।"

"মুখের বড়াই কি করিবে মা, আগে মনকে বোঝাই।"

"আর পাগ্‌লামি কর না রমেশ, মার মুখ চাহিয়া স্বীকার কর।"

"মুখ আমি কাহারও চাহি না, সেটা তুমি যেমন জান এমনত আর কেহ জানে না, এবার ইচ্ছা করিয়াই স্বীকার করিতেছি, চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।" বলিয়া সে সুশীলার বাহুবন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার অজ্ঞতসারেই যেন একটা শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হইতেছিল। ওধার হইতে হাতের ছাউনিতে সরযূ ডাকিল। রমেশ মন্দ গতিতে সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"বিবাহ কি ঠিক হইয়া গেল?"

রমেশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জোর দিয়া বলিল—"কেন হইবে না, ঐটে যে এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া মা ভয় করেন, তুমি তাড়া লইয়া উপস্থিত হও, তবে কোন্ আশায় কি সুখে আত্মাকে বঞ্চনা করিব, বঞ্চনার যে সুখ, তাহাও ত তোমাদের সহ্য হইতেছে না।"

"মিথ্যা কথা।" বলিয়া সরযূ আরও নিকট ঘেসিয়া দাঁড়াইল, দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া বলিল—"তাড়া আমি কেন করিতে যাইব, সুখটা আমার হৃদয়ে এত অধিক নাই যে, কাহাকেও তাড়া করিয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনিব।"

রমেশ কঠোর কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার ইচ্ছা, এই ভাবেই জীবন-যুদ্ধের মাঝখানে বাঁচিয়াও মড়ার মত অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকি?"

"দোষই কি?" বলিয়া সরযূ নীরব হইল।

রমেশ বলিল—"দোষ যদি না থাকিত, এ ইচ্ছা করিতাম না সরযূ, দেবদেবীর মত স্মৃতির পূজাতেই জীবন কাটিত, এখন দেখিতেছি, তাহাতেও রক্ষা নাই, তোমাদের উপদ্রবই হইতেছি।" রমেশ আর বলিতে পারিল না, সুশীলার সন্দেহসঙ্কুল বৃত্তিগুলি মনে পড়ায় সে পাগল হইয়া উঠিল।

সরযূ তার স্বরে বলিল—"বিবাহ করিবে, সুখী হইবে, তাহাতে বারণ করিব, এমন অধিকার আমার কি আছে, আমি বলি স্মৃতিটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য যদি এতই ব্যস্ত হইয়া থাক, একটা কষাই ডাকিয়া দাও, এ দেশে তাহার অভাবও হইবে না। সে আসিয়া জীবন্ত আধারটা কাটিয়া দিক, রক্তে স্নান করিয়া তোমাদের বাসনা চরিতার্থ হক। মায়াই যদি কাটাইতে পারিলে, ছায়া রাখিয়া লাভ।"

রমেশ আত্‌কাইয়া উঠিল, সকাল আর সন্ধ্যায় সরযূর একি পরিবর্ত্তন। সুশীলার সন্দেহটা যে সরযূকে এমন ভাবে বিপথের পথিক করিয়া তুলিয়াছে, তাহা রমেশ বুঝিতে পারিল না। সে ব্যাকুল হইল, উদ্বিগ্ন অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"বিবাহ আমার করিতেই হইবে সরযূ, যদিও সন্দেহ ছিল, তুমি একেবারে নিশ্চয়ে আনিয়া দিলে।"

[২৪]

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন আছেন, বেদনাটা একটু কমিয়াছে কি ?"

"বেশ আছি মা, ঘুম হইতে জাগিয়া অবধি বেদনার টেরও পাইতেছি না।"

কমলা আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"বেশ আছি বলিলে চলিবে না, এবার আপনাকে ওষুধ খাইতে হইবে, প্রতিদিন এমন যন্ত্রণা হইলে যে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" বলিয়া সে হাত-পাখায় বাতাস করিতে লাগিল।

ইন্দুমাধবের দুঃখাভিভূত চিত্ত অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন—"রমেশ এখন আর বাড়ীতে আসে না, না মা ?"

কমলা কথাটা বুঝিল, গোপন করিয়া বলিল—"আসেন বৈকি ?

যখন তখন আসিয়া যা তা খাইয়া চলিয়া যান, এই তাঁর যেমন স্বভাব।”

“কোন্ সুখে শরীর থাকিবে?” বলিয়া ইন্দুমাধব আকুল কান্নাটা চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন—“আমি ভাবিতেছি, তোমার একটা উপায়ের কথা।”

“আমিত বেশ আছি”—বলিয়া কমলা চাপা শ্বাস ত্যাগ করিল, গম্ভীর হইয়া বলিল—“উপায় সে ভগবান্ করিবেন, তার আগে কিন্তু একটা কাজ আমায় করিতে হইবে।”

“আগে, না না তার আগে নয়, আমি কদিন আছি কি নাই, বলা যায় না, তোমাকে এমন ভাবে রাখিয়া মরিলে আমার যে বড় অশান্তি থাকিয়া যাইবে, পাগ্‌লামি ছাড় মা, আমি যোগেশকে বলি।”

কমলার চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—“কেন আপনার সেবা হইতে বঞ্চিত করিতে চান, বলুন ত। কি এমন অপরাধ করিয়াছি।”

ইন্দুমাধব কমলার হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—“বঞ্চনা কেন করিব, এ সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমিই কি বাচিব মা, যোগেশকে বলিয়া আমি তোমায় এখানেই রাখিব।”

কমলা বলিল—"যাই, আপনার দুধটুকু লইয়া আসি।"

"সে হবেখ'ন।"

"না না, ওবেলা যে আপনার খাওয়াই হয় নাই, এমন অসময়েই বুকের বেদনাটা উঠিল যে, দুমুঠা ভাত মুখে দিতে পারেন নি।" বলিয়া কমলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ইন্দুমাধবও কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"তাই যাও মা, দেখি দুধ খাইয়া যদি শরীরটা সবল বোধ করি।"

দুগ্ধের বাটী হাতে কমলা আসিয়া দাঁড়াইল, স্মিতহাস্যে বলিল—"একটা কাজ কিন্তু আপনাকে করিতে হইবে।"

ইন্দুমাধব বিস্মিত জিজ্ঞাসু নেত্রে কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কমলা গম্ভীর হইয়া বলিল—"কন্যাবিবাহের যে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এর কোন প্রতিকার না করিলেত দেশ থাকে না।"

দুগ্ধের বাটীতে চুমুক দিয়া ইন্দুমাধব বিস্ময়ের হাসি হাসিলেন, বলিলেন—"এর আবার প্রতিকার কি? তোমার আমার শক্তিই কত যে চেষ্টা করি।"

কমলা অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিল, তাহার অনেককালের চিন্তা ঘুরিয়া গেল, রমেশের উপদেশগুলি এই দুইদিন সে বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছে, রমেশ বলিত—"শিক্ষা দিতে হয়, আমাদের দেশের শিক্ষাই দিতে হইবে, উপযুক্ত লোক

চাই, যাহারা স্ত্রীহৃদয় গঠন করিতে পারে। স্ত্রীলোকের হৃদয় কোমল, সেখানে এমন শিক্ষার প্রয়োজন, যে শিক্ষা' তাহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেয়, ঐ কথাকয়টির সারমর্ম্ম কমলা নিজের মনোমত করিয়া ভাবিয়া লইল, লেখাপড়া সম্বন্ধে পিতার সঙ্গে সে যে বিরুদ্ধ তর্ক করিয়াছে, তাহার সমাধান এই ভাবে করিয়া সে হৃষ্ট হইল। স্থির সঙ্কল্পের একটা দীপ্তি যেন তাহার পুলকোজ্জ্বল চোখের উপর ভাসিতেছিল— "চেষ্টা করিতেই হইবে, শক্তি কার কি আছে না আছে, তাহাও সময়ে বোঝা যাইবে, কার্য্যে ভিন্নত শক্তির পরীক্ষা হয় না।"

ইন্দুমাধব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করিতে চাও!"

কমলা একটু চিন্তা করিল, নিবীড় চিন্তায় যেন তাহার মুখ চোখ সাদা হইয়া উঠিল, দৃঢ় স্বরে বলিল—"সবাই যে ভাবে ভাবিয়াছে, সেই পূরণ পথ ছাড়িয়া নূতন পথ ধরিতে হইবে।"

স্তব্ধ ইন্দুমাধব চাহিয়া রহিলেন, কমলা বলিয়া চলিল— "বিবাহ না করিয়া পুরুষের ধর্ম্ম যদি বজায় থাকে, মেয়েদেরই কেন থাকিবে না।"

"পুরুষ আর মেয়েতে কি সমান হয় মা?" বলিয়া ইন্দুমাধব হাসিলেন!

কমলা ছোট্ট কথায় বলিল—"কেন হয় না?"

"পুরুষ জ্ঞানগরিমায় ভুলিয়া থাকিতে পারে, কার্য্যের অভাব

নাই, কাজের মধ্যে যদি আপনাকে ঢাকিয়া রাখে, তবে ত চির জীবন অন্য চিন্তা না করিলেও পুরুষের কোন হানি হয় না।"

"কাজ কি মেয়েদেরই বড কম, আর জ্ঞান, সেওত পুরুষের একচেটিয়া নহে।"

"তেমন শিক্ষার যে কোন ব্যবস্থা নাই মা!"

"আমি তাহাই করিতে চাই।" বলিয়া কমলা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, একটা কোন কাজের আড়ালে আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছিল। বলিল—"এমন একটা ব্যবস্থাই করিতে হইবে, যাহাতে মেয়েরাও ঠিক পুরুষের মত শিক্ষাদীক্ষায় আপনার মন গঠন করিতে পারে, গাধার মত বোঝা বহিবে, চিনি কি চিটার স্বাদ পাইবে না, এ যদিও কোন কালে চলিত, এখন আর সেদিনও নাই, সে ভাবে চলিতে গেলে মুণ্ড পাতেরই চেষ্টা করা হইবে।" কমলা থামিল, কর্ত্তব্য কার্য্যের ভাবী আদর্শ তাহার উচ্ছলিত হৃদয়ের আবেগ বিদলিত করিয়া বাহির হইতেছিল। আবার কি চিন্তা করিল, বলিল—"এমন যদি হয় যে, মেয়েদেরও একটা কিছু লইয়া থাকিবার উপায় জোটে; উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিবাহ নাই হয়ত তাহারাও দেশের দশের কাজ করিতে পারে।"

"এদেশে সে হইবে না—"

কমলা বাধা দিল, বলিল—"হইবে না বলিয়া চুপ করিয়া

বসিয়া থাকিলে দিন দিন অধঃপাতেই যাইতে হইবে। কন্যা-বিবাহের জন্য পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, মাতা মড়াকান্না কাঁদিবেন, অবশেষে মানুষ জানোয়ার বিচার না করিয়া গলায় দড়ি ঝুলাইয়া মেয়েটাকে ছুড়িয়া ফেলিবেন। চিরজীবনের জন্য দুঃখকে বরণ করিয়া কন্যা স্বামীর ঘর করিতে যাইবে। মাতাল হউক, বদমাইস হউক, একসন্ধ্যা আধপেটা খাইয়াও তাহাকে স্বামিসেবা করিতে হইবে। এতেত ধর্ম্ম থাকে না, বরং বিপ্লব বাড়িয়া যায়। ইহা অপেক্ষা তোমরা যেমন বাছিয়া দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবে, মেয়েরা না হ'ক, অন্ততঃ পিতামাতাও সেরূপ বাছিয়া দেখিয়া শুনিয়া সম্ভব হয় কন্যা পাত্রসাৎ করিবেন, অসম্ভব হয় অবিবাহিতা রাখিবেন, কন্যা আমরণ পিতৃগৃহে থাকিয়া নিজের কাজ করিবে।"

নিরাশার দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ইন্দুমাধব বলিলেন—"সমাজত একথা মানিবে না মা।"

"সমাজ ত একজন লইয়া নহে, যদি ইহার সুফলের কথা সমাজের হৃদয়ে প্রবেশ করান যায়, সমাজ আপন হইতে স্বীকার করিবে, এমনই একটা কিছুর যে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যাহার মেয়ে আছে, সেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে, হাতের কাছে কোন উপায় খুজিয়া পায় না বলিয়াই সমাজের তৌলদণ্ডের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, অসাড়ে অশ্রুত্যাগ ভিন্ন আর উপায় থাকে না।"

ইন্দুমাধব বলিলেন—"বিবাহ না হইলে, মেয়েরা স্বাধীন হইয়া

পড়িবে, তাহাতে একটা উচ্ছৃঙ্খল গতি সমাজকে ওলটপালট করিয়া দিবে, অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট ত হইবে না।”

“ঐটেই হইতে দিতে চাহি না, বিবাহ না হইলেও তাহারা যাহাতে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের অধীনে থাকিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে, এমনই একটা জিনিষ ইহাদিগকে দিতে হইবে যে, বৃথা স্বাধীনতা না দেখাইয়া তৎপরিবর্ত্তে নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া অধীনতাকে মঙ্গলের পথ বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লয়।”

“উপায় ?”

“উপায় উচ্চশিক্ষা, আপাততঃ আমি ঐ কার্য্যেই ব্রতী হইতে চাহি, যাহাতে এদেশের মেয়েরা এদেশের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে, আর্য্যধর্ম্মের স্বাদ বুঝিয়া আর্য্যাচরিত পথকে প্রশস্ত বুঝিতে পারে; সংযম শিখিয়া নগণ্য রিপুগুলিকে পদদলিত করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। তাহাতেই এদেশ জয়যুক্ত হইবে, পিতামাতার গলার বেড়ী খসিয়া পড়িবে, দুর্ভাগ্যদেশের রমণীগণ এই যে অকালে অকার্য্যে আত্মহত্যা করিতেছে, সে পথ বন্ধ হইবে। নারীর গৌরবে, মাতার গৌরবে সমস্ত আর্য্যনারী দেশকে গৌরবিত পুলকিত করিয়া দিবে।” বলিতে বলিতে কমলা কাঁদিয়া ফেলিল, উচ্চভাবের ভাবনা, তাহার গভীর মনকে আলোড়িত করিয়া যেন প্রবাহের মত নয়নের কোণে আসিয়া দেখা দিল।

[২৫]

যোগেশ তাহার পরিজনহীন বন্ধনহীন নিষ্কণ্টক জীবন বেশ একভাবে কাটাইয়া চলিতেছিল, পুস্তকের পাতার মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া কাগজের পোকার মত দিন গুজরান শক্ত বা দুঃসাধ্য বলিয়া কোন দিন মনেও করে নাই, সহসা নেমীচক্র ঘুরিয়া গেল। ইন্দু-মাধব অসম্ভব প্রস্তাবে তাহার মনের কোণে একটা দাগ বসাইয়া দিলেন। ক'দিন সে মনোযোগ করিয়া পড়িতে পারিতেছিল না, অন্তরাত্মা যেন একটা আশ্রয়ের অন্বেষণে ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ম্মহীন, ক্লান্তিহীন নিঃসঙ্গ বিশ্রাম সে আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না, মনে মনে বলিতেছিল,—"কি করিয়া দিন কাটাই, আগেত এমন হইত না, সময়টা যে ভার তাহাত আমি একবারের জন্যও অনুভব করিতাম না। মুহূর্ত্তের তরেও কেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা করিলাম। পরের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার ইচ্ছায়ও যে মহাপাপ, বেশত ছিলাম, কেহ আমার খোঁজ করিত না, আমিও কাহারও সঙ্গ চাহিতাম না। আরত এভাবে চলে না, বিবাহ করিব না ধ্রুব, কেন না কমলাকে পাইবার আশা নাই, বোধ হয় সে স্পৃহাও আমার পক্ষে অপরাধের বোঝা হইয়া বসিবে। মনকে কি করিয়া বোঝাই, একটা কার্য্যের আড়ালে নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে।"

হাতের গোড়ায় কোন কাজ না পাইয়া সে দুইদিনেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, একঘেয়ে পুস্তকের পাতার উপর এক মুহূর্ত্তেই যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল।

মেসের পাশের বাগানে নবপুষ্পিত আম্র ও বকুল গন্ধ ছড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল। সেই একান্ত নিভৃত বাগানের এককোণে অশোকের ছায়ায় বসিয়া যোগেশ স্নিগ্ধ বাতাসে মালতীফুলের সুবাস গ্রহণ করিতেছিল। গোলাপফুল তখনও বেশ প্রস্ফুটিত হয় নাই, যেন নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন, বায়ুর স্পর্শে সবেমাত্র শাখাবাহু প্রসারণে আলিঙ্গনের চেষ্টা করিতেছে। ভ্রমরগুঞ্জনের বিরাম ছিল না। কিছু পূর্ব্বে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, শুষ্ক মাটি গলিয়া বেশ একটি আরামপ্রদ সৌরভ ছুটিয়া আসিতেছে। যোগেশ বামহস্তে কপোল রাখিয়া চিন্তা করিতেছিল, আর বলিতে-ছিল,—"এবার কাজে লাগিয়া পড়িতে হইল।" কিন্তু কি কাজে যে লাগিতে হইবে, তাহার খোজ খবর ছিল না, এমন সময় ইন্দুমাধব-বাবুর ডাক লইয়া বেয়ারা আসিয়া হাজির হইল। যোগেশের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, তবু যেন সে হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। একখানা উড়নীমাত্র গায়ে ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এ বাড়ীতে ঢুকিতেই ইন্দুমাধব সঙ্কুচিত স্বরে বলিলেন,—"যোগেশ আসিয়াছ বাবা, তোমায় কমলা ডাকিয়াছে।"

যোগেশের প্রাণ এবার দ্বিগুণবেগে কাঁপিয়া উঠিল, কমলা

গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা থমকিয়া গেল, পরক্ষণেই নিজের দৌর্ব্বল্যটা কাটাইয়া দিয়া বলিল—"যোগেশবাবু, আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ধৃষ্টতা করিয়াছি, মাপ করিবেন।"

যোগেশ ভূতাবিষ্টের মত চাহিয়া রহিল, কমলার অঙ্গভঙ্গী যেন তাহার সবল-আকর্ষিত মনের কোণেও মৃদু আঘাত না করিয়া ছাড়িল না। কমলা বলিল—"আমি একটা কাজে হাত দিব ভাবিয়াছি, কিন্তু জানেন ত আমরা অকর্ম্মণ্য জাতি, আপনাদের আশ্রয় ছাড়া এক পা বাড়াইবার শক্তি রাখি না।"

যোগেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল—"ভূমিকা রাখুন, কি করিতে হইবে, তাহাই বলিয়া দিন, সাধ্যের অতীত না হইলে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।"

কমলা মাথা নীচু করিল, যোগেশের উৎকণ্ঠাটা যেন রমণীস্বভাব-সুলভ লজ্জার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, যোগেশ বলিল—"আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না, যা বলিবার থাকে বলুন, আমি আপনার কোন কাজ করিতে পারিলে ভাগ্য মনে—"

সহসা যোগেশ থামিল, কি বলিতে গিয়া সে যে কি বলিতে বসিয়াছে, ভাবিয়া তাহার মন দ্বিধায় উৎকণ্ঠায় বসিয়া গেল। নিজেদের এই প্রচ্ছন্ন জড়িত ভাব ও ভাবাটিকে সহজ করিয়া লইবার জন্য কমলা কাজের কথা পাড়িল, বলিল—"একটা মেয়ে-স্কুল

করিতে হইবে, আমার ইচ্ছা সাধারণত তাহাতে এদেশীয় শাস্ত্রেরই শিক্ষা হইবে, আপনারও তেমন কোন কাজ নাই, আমারও না, দুই দুইটা নিষ্কর্ম্মা লোকেরই প্রথম এতে দরকার, কারণ সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া চেষ্টা করিতে না পারিলে এদেশে এসব কাজের সুরাহার আশাই করা চলে না।"

বিস্মিত যোগেশ সহজ স্বরে বলিল—মেয়ে-স্কুলেরত অভাব নাই, তবে আবার এ চেষ্টা কেন?"

"ঐত বলিলাম, যেগুলি আছে, তাহা হইতে একটা পৃথকত্ব রাখিতে হইবে, চারুপাঠের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া এখানে ব্যাকরণের খিচিমিচি শিক্ষা করিতে হইবে।"

অনাবশ্যক হইলেও কৌতূহলী যোগেশ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"প্রয়োজন?"

মধুপুরে থাকিতে পিতার নিকট কমলা কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছিল, হাসিয়া বলিল—জানেনত 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।' এর ভিতরও এমনতর একটা মস্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহার সবখানি বলিয়া শেষ করা একবারে সম্ভব হইবে না, আপাতত এইটুকু বলিতে পারি, মেয়েদের মনে একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আনিবার চেষ্টা করিব।"

যোগেশ উদাসীন ভাবে হাল্কা কথায় জিজ্ঞাসা করিল—"কারণ?"

"বিবাহ না হইলেই মেয়েদের জাতি যাইবে, অন্য উপায়ে জাতি রক্ষার উপায় করিয়া এ কথাটা আমি সমাজের মুখ হইতে তুলিয়া দিতে চাহি, আপনারা যেমন বিবাহ করিবেন না বলিয়া অনায়াসে মত প্রকাশ করিতে পারেন, আবশ্যক হইলে অর্থাৎ ঠেকা হইলে কন্যার পিতামাতাও সে কথা বলিবেন, উচ্চশিক্ষিতা কন্যাকে ঘরে রাখিতে ভীত হইবেন না, কন্যার বিবাহের জন্য সর্ব্বস্বান্ত না হইয়া, গলায় দড়িকলসী না ঝুলাইয়া তাহাকে ঘরে রাখিয়াই সুখে না হক, শ্বস্তিতে ঘর সংসার করিতে পারিবেন।"

"এই না বলিতেছিলেন, পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন, আপনারা কোন কাজই করিতে পারেন না" --বলিয়া যোগেশ একটু হাসিল।

কমলা সে হাসিটুকু উপেক্ষা করিল না, জোর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া উত্তর করিল,—"আমি যে পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছি, এমন কথা আপনি কেন মনে করিতেছেন, আমার বিশ্বাস যথার্থ শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে মানুষ আপনার অধিকারের অতিরিক্ত কিছু প্রার্থনা করে না, তাহা হইতে এও আশা করা যায়. স্ত্রীলোক স্বামীর অভাবে অভিভাবকমাত্রের অধীনে থাকিতে৷ স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বীকার করিবে, অধিকন্তু ভুল করিয়া অধীনতা স্বীকার. । করিলেও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।"

সন্দিগ্ধ স্বরে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না, বিবাহপ্রথাটা উঠাইয়া দিতে চাহেন কি।" যোগেশের

স্বর কাঁপিতেছিল, দীর্ঘ সময় ধরিয়া কমলার এই অকুণ্ঠিত সহজ আলাপে তাহার সুপ্ত বাসনাটা পিপাসিত জিহ্বা বাহির করিয়া সোর-গোল বাধাইয়া তুলিয়াছে।

কমলা না হাসিয়া পারিল না, প্রভাত সূর্য্যকরের মত নির্ম্মল হাসিরাশি ছড়াইয়া দিয়া বলিল—"বলেন কি আপনি, এমন অভাগাও কেউ আছে যে, এই পবিত্র বন্ধনটা উঠাইয়া দিবার কথা মনেও আনিতে পারে। অমন দুইটি জিনিষ যে পৃথিবীতে নাই। দাম্পত্য-বন্ধন, প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম যে দেবদুর্ল্লভ রত্ন, এবং তারি উপর নিঃসঙ্কোচে নির্ভর করিয়া এ দুর্ভাগ্য দেশ আজও বাঁচিয়া আছে। আমার উদ্দেশ্য অন্য রকম, প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেমের যেখানে আশা থাকিবে না, যেখানে পাত্র জোটান অসম্ভব হইবে, সেখানে কন্যা বিবাহ স্থগিত থাকিবে; বানরের গলায় মুক্তার মালা না পরাইয়া মালাগাছা ঘরে রাখিয়া দিবে, তাহাতে গৃহ আলোকিত হইবে, আর্য্য-ধর্ম্ম বজায় থাকিবে; পিতামাতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে না। সতী রমণীর হাহাকার কমিয়া আসিবে, তাঁহাদের অকালমৃত্যু ও আত্মহত্যার হাত হইতে এ দেশ উদ্ধার পাইবে। পুণ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য পাপভার না বাড়াইয়া পুণ্যের অনুগমনে আমরা ধন্য হইব, কৃতার্থ হইব।" বলিতে বলিতে কমলা কাঁদিয়া ফেলিল।

যোগেশ স্তব্ধ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"ও কি? আপনি কাঁদিতেছেন?"

"আমার পিতার কথাই ভাবুন যোগেশবাবু, তিনি যদি একবারের জন্যও ভাবিতে পারিতেন, বিবাহ না হইলে আমার কোন দুঃখ হইবে না, যেমন আছি, তেমনি থাকিব, কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না, তবে কি এমন ভাবে আঘাতের দাগ বুকে করিয়া এত অল্পকালে তাঁহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইত ?"

যোগেশ নিজেকে আর সাম্‌লাইতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল—"বিবাহ না হইলে সত্যই কি আপনার কোন দুঃখ হইবে না ?"

কমলা একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"আমার কথা ছাড়িয়া দিন, ধরুন, আপনি যেমন বিবাহটাকে আবশ্যক বলিয়াই মনে করেন না, মেয়েদের মধ্যে কেউ যদি এমনটি পারেত তাহারও কোন কষ্টের কারণ ঘটিবে না।" এইভাবে কমলা যোগেশকে পৃথিবীর কাছে একেবারে নিস্পৃহ করিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বলুন এতে আপনি স্বীকৃত আছেন ?"

যোগেশ কমলার প্রশংসা করিয়া মনে মনে বলিল—"কেবল কষ্ট না পাওয়াই উদ্দেশ্য নহে, কষ্টকে গোপন করিবার যে শক্তি, সে শক্তি সঞ্চয়ই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলাম।"

সন্ধ্যা পার হইয়া গেল, কমলার সঙ্কল্পের সার্থকতা ঘোষণা করিয়া গৃহে গৃহে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, অন্ধ-

কারের ঘনচ্ছায়া লইয়া মেঘমুক্ত আকাশে রাত্রি আসিয়া আপন আসন পাতিয়া বসিল। দূর দিগন্তের শুভ্র জ্যোৎস্নাটুকু নিবিয়া গেল, কলিকাতার গ্যাসের আলো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইন্দুমাধব অনেকক্ষণ হইল বাহিরে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, গৃহে ঢুকিয়া বিস্মিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখনও তোমাদের কথা শেষ হয় নাই মা ?"

কমলা মাথা নীচু করিল—"আজকের মত হইয়াছে, যাই আপনার আহ্নিকের জায়গা করিয়া দি।" বলিয়া চলিয়া গেল।

[২৬]

দুই নৌকায় পা দিয়া আরোহী যেমন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, রমেশও ঠিক তেমনই হইয়া পড়িয়াছিল, কি করিলে, সব দিক্ বজায় থাকিবে, তাহা তাহার বুদ্ধিতে আসিত না। মুখে স্বীকার না করিলেও সরযূর আদর্শ যে প্রতিবিম্বের মত ভিতরে বাহিরে স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া জাগিয়াছিল, মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিত না, পিতার একটিমাত্র কথায় কর্ত্তব্যে দৃঢ় স্নেহে কোমল অতিবড় একটা হৃদয়ের প্রতি সে যে অবিচার করিয়াছে, সে অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত কোন্ ভাবে কেমন করিয়া করিলে যে, ঠিক হইবে তাহাই তাহার ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিগূঢ় পরিতাপে কমলার জন্যও

তীব্র অনুতাপ ও ব্যথা সময়ে অসময়ে হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিত; সে ব্যথাটা রমেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিত; বন্যার মত সরযূর চিন্তাপ্লাবন বেগগামী হইয়া কমলার কথাটা ভাসাইয়া লইত; কমলার আভাসমাত্রে রমেশ কাঁপিয়া উঠিত; সজোরে সে ভাবনা দূর করিয়া দিয়া ভাবিত, সরযূই তাহার সব, সরযূই সর্ব্বস্ব, দুদিনের জন্য সে যে অপরিচিত পথে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহার জন্য সরযূ ত্যাগের বস্তু হইতে পারে না। তাহাকে গ্রহণ করিয়াই হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে হইবে। কমলা দেবী, স্নুধু স্নেহ, প্রীতি বিলাইবার জন্যই ভগবান্ তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। রমেশ এ চিন্তায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, বিধবা ব্রহ্মচারিণীর কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়া নিজের অবিচারের জন্য অনুতপ্ত হইত! বিপরীত ভাবনায় আলোড়িত হইয়া মনে মনে বলিত—"সরযূকে পৃথিবীর করিয়া লইবার যে স্পৃহা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নিজের মনকে সংযম-কঠোর করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহার কার্য্য সে করিয়া যাক, আমি কেন বাধা দিতে যাইব।"

প্রতিকূল ভাবনা আসিত, নিজের শক্তির প্রতি রমেশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। দুর্ব্বলতার জন্য লজ্জিত হইত, তখন আশা তাহাকে আশ্বাস দিত, "তুমি না পারিলেও সরযূ তাহার নিজের জোরে আত্মরক্ষা করিবে। তোমাকে তাহার অঙ্গুলিও স্পর্শ করিতে দিবে না।" রমেশ আশ্বস্ত হইত, হাপ ছাড়িয়া

বাঁচিত, বলিত—"তাহাই হউক, আমার পাপের প্রতিশোধ যদি সরযূ নিজেই লইতে পারে ত বড় একটা কাজই হইল।"

সেদিন সরযূর অতবড় দুর্ব্বলতাটা রমেশকে একেবারে আশার বাহিরে আনিয়া ফেলিল, এতদিন সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছিল, আজ সে নিশ্চয় করিয়া বসিল—বিবাহ না করিলে উপায় নাই, ছাই চাপা আগুন বেশীক্ষণ ঢাকা থাকে না, বাতাস পাইলেই বাহির হইয়া পড়ে, এখানে এমনই একটা কিছু চাপা দিতে হইবে, যাহার চাপে হয় রমেশ শোধ্রাইবে, নয় গুড়াগুড়া হইয়া অণু-পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া রমেশ বাড়ীতে আসিল, ধীর পাদক্ষেপে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তেজোহীন অস্বাভিক স্বরে ডাকিল—"কমলা?"

কমলা দেওয়ালে ঠেস দিয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, রমেশ অন্য প্রসঙ্গমাত্র না তুলিয়া বলিয়া ফেলিল—"আমি বিবাহ করিব কমলা?"

"বেশত, আপনার বাবাকে বলিব, একটি ভাল মেয়ে দেখিয়া শীঘ্রই বিবাহটা সম্পন্ন করেন।"

কমলার কথায় একটু জড়তা একবিন্দু চাঞ্চল্য ছিল না, উপহাসের আভাসহীন, চিন্তার লেশশূন্য, যেন পূর্ব্ব হইতেই সে প্রস্তুত হইয়াছিল। রমেশ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়ে আবার কেন দেখিতে হইবে, বাবা যে

মেয়ে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছেন, আমিত তাহাকে ত্যাগ করিব না।”

কমলা ভাবিল, রমেশের কি একটু লজ্জাও নাই। বলিল—“আমি কাহারও ভার হইতে চাহি না, বিপন্ন দেখিয়া আপনারা যতটুকু দয়া করিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। জানেন ত প্রার্থীর প্রার্থনা যতই পূরণ করিবেন, তাহা না কমিয়া বরং বাড়িয়াই উঠিবে।”

রমেশ উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—“ভার কেন হইতে যাইবে, আমি যে বুকের ভার কমাইবার জন্যই তোমার আশ্রয় চাহিতেছি।”

কমলার লোটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল, এতদিনপরে এই ‘তোমার’ কথাটা তাহার হৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন করিল, মরুভূমিতে এককালে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইয়া গেল। অবাধ্য অশ্রু জোর করিয়া রোধ করিবার শক্তির জন্য সে ছটফট্ করিতে লাগিল। তাহার দুর্ব্বলতাটা যদি রমেশ ধরিয়া ফেলে তবে ত আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। অতিকষ্টে অনুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—“চিটার মিষ্টান্ন যে অখাদ্য হইবে রমেশবাবু, আমি আপনার কোন্ কাজে লাগিব।”

রমেশের মনে সহসা কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। আচ্ছন্নের মত বলিয়া বসিল—“যোগেশের সঙ্গে কি তোমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে?”

নিবীড় ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে কমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল, রমেশ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। কমলা খোচা দিয়া বলিল—"সে খবরেই আপনার প্রয়োজন কি? যাহার সুখদুঃখ শুভাশুভের জন্য আপনি ধর্ম্মত দায়ী, মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা যাঁহার হাতের উপর বিশ্বাস করিয়া আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন, সেই আপনি কি একবার খেয়ালেও চিন্তা করেন, কমলা আছে কি মরিয়া গিয়াছে।"

"সে কি কথা কমলা"—বলিয়া রমেশ নিজের অধরোষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। কমলা উত্তেজিত স্বরে বলিল—"আমার কথা ছাড়িয়া দেই রমেশবাবু, বৃদ্ধ পিতা যে আপনার ব্যবহারে দিন দিন শুকাইয়া সারা হইলেন, একবার সে খোজও কি করিয়া থাকেন।"

যথার্থ তিরস্কারের উত্তর রমেশ খুজিয়া পাইল না, জীবনে নূতন এই তিরস্কারটা আজ তাহার মনের উপর অনেক কাজ করিল, এমনি তিরস্কার করিবার একটা লোক যদি থাকিত ত সে এমন উচ্ছৃঙ্খল হইত না। কমলার মুখ খুলিয়া গিয়াছিল, সে আবারও বলিল—"আমার জন্য আপনি বাড়ী ছাড়িয়াছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সংসারের শ্রেষ্ঠ দেবতা পিতার পর্য্যন্ত সংবাদ রাখেন না। কেন, আমি আপনার কি ক্ষতি করিয়াছি? আমি বাঘ না ভালুক যে সামনে দিয়া হাটিলে গ্রাস করিয়া

খাইয়া ফেলিব, পালাই পালাই করিয়া দিন দিন নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতেছেন, ছিঃ ছিঃ আপনার লজ্জা করে না, নয়ত আমাকে তাড়াইয়া দিন, বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া এ অপমানে লাভ ?” কমলা কাঁদিয়া ফেলিল, হৃদয়ের প্রগাঢ় আবেগ তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিল।

রমেশ কেবলমাত্র বলিল—“আমার অন্যায়ের ত শেষ নাই কমল, তোমরা আমায় ক্ষমা কর !”

“আমি ক্ষমা করিব, আমি কে, একটা চাকরদাসীর যে অধিকার আমায় কি আপনি সে অধিকারটুকুও দিয়াছেন, যান যান, এত বিদ্রূপের সময় নয়, আপনাদের বাড়ীতে আসিয়া অন্যায় করিয়াছি, আজ আমিই তার জন্যে আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, আমাকে বিদায় দিন, আপনি বাড়ীতে আসুন, দুঃখের সংসার সুখের হইবে।” বলিয়া কমলা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া কণ্ঠরুদ্ধ কান্নার বেগ হাল্কা করিতে লাগিল।

নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া জ্যোৎস্নারাশি আসিয়া ঘরের মধ্যে কমলার মুখের উপর পড়িয়াছিল, ভগ্ন ভিত্তির ছিদ্রপথে শিশিরসিক্ত মৃদু বায়ু প্রবেশ করিয়া তাহার মলিন মুখে স্নেহের হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা করিতেছে। দীপের আলো মুখে পড়িয়া কমলার প্রদীপ্ত চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সুবাসিত আলুলায়িত কুন্তল এলোমেলো হইয়া মুখে কপোলে পড়িয়া বাতাসে দোল খাইয়া

মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল। রমেশ সেই উদ্দীপ্ত গ্যাসালোকের মত উজ্জ্বল, শারদ জ্যোস্নার মত কোমল, ক্লান্ত অথচ লাবণ্য-পরিপূর্ণ, নিরাশ্বাসের পীড়নে পীড়িত, অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক, তেজোময় অথচ রমণীসুলভ কারুণ্যবিজড়িত কমলার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া মুহূর্ত্ত নিমেষহীন চাহনিতে সিদ্ধির অভিলাষী সাধকের ন্যায় চাহিয়া রহিল, তাহার মন তখন সরযূর কথা ভুলিয়া জগতের কথা ভুলিয়া অনাথিনী কমলার জন্য উতলা হইয়া উঠিয়াছিল, দুই হাতে এই পিতৃহীনার দুঃখ দুর্দ্দশা মুছিয়া দিবার জন্য চিত্ত উদ্ভ্রান্ত। রমেশ এক পা বাড়াইল, এক মুহূর্ত্ত মৌন চিন্তা করিল, সহসা সে কমলার হাত জড়াইয়া ধরিল, কমলা এক পা নড়িল না, হাত ধরিয়া একটু টান পর্য্যন্ত দিল না, একটি কথা বলিল না, তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিরস্ত হইল, মুখ সাদা হইয়া গেল, রমেশ চাহিয়া রহিল, এক সময়ে সে বলিয়া বসিল—"বল কমল, আমায় ক্ষমা করিবে!"

কমলা এত বড় আশাটাকে হৃদয়ে পোষণ করিতে সাহসী হইল না, নিষ্ঠুর ভাবে বলিল—"সে বিচার সময়ে করা যাইবে।" হাত টানিয়া লইতে পারিল না, এ স্পর্শটি যেন তাহাকে সুখের সাগরে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।"

রমেশ বেগে হাত টানিয়া লইল, অজ্ঞাত সন্দেহ তাহার মনের কোণে জটলা পাকাইতেছিল, সে উচ্চকণ্ঠে বলিল—"আমি সময়ের

জন্যই অপেক্ষা করিয়া থাকিব।" বলিয়া দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

কমলা বসিয়া পড়িল, এক ত তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল, ইহার উপর আবার অভুক্ত রমেশ এমনই ভাবে চলিয়া যাওয়াতে বুকে যেন পাষাণ চাপিয়া বসিল।

[২৭]

সুশীলার পূজা তখনও শেষ হয় নাই, সরযূ মাতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের গোড়ায় কোন কাজ ছিল না, অথচ ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিতেছে। দুদিন সে অন্য চিন্তা ছাড়িয়া দিয়াছে, সর্ব্বপ্রকারে মাতার অনুগামী হইবার জন্য মনকে বোঝাইতেছিল, সে দিনের সেই দুর্ব্বলতা তাহাকে দারুণ যাতনায় পীড়িত করিতেছিল, নিজের কথাগুলি মনে করিয়াই সে উগ্রবেদনা অনুভব করিতেছে, লজ্জায় ঘৃণায় ধিক্কারে জ্বলিয়া মরিতেছে, হিন্দু বিধবার অনুচিত এমন কার্য্য সে কেন করিল; এত দিন রমেশের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া সে তাহারই প্রতিকূলে মনকে গঠন করিতেছিল, হঠাৎ তাহার একি হইল, মাতার অযথা সন্দেহ সরযূকে দেশকালপাত্র বিস্মৃত করিয়া দিয়া কেন এমন লজ্জার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। রমেশ বিবাহ করে করুক, তাহাতে তাহার কি ন্যায় আসে। রমেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ত এক দিনেই ফুরাইয়া গিয়াছে, তবে

আর কেন, ভোগসুখ তাহার বরাতে নাই, থাকিলে বিবাহের তিনমাস যাইতে না যাইতেই এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন, তাহারত কোন অভাব ছিল না, মাত সর্ব্বপ্রকারে বিবেচনা করিয়া বড় ঘরে উপযুক্ত পাত্রের হস্তেই তাহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, সুখ যদি অদৃষ্টে থাকিত, সে দীর্ঘ নদী এমন করিয়া শুষ্ক হইবে কেন? সরযূ ঠিক করিয়া লইল, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই, কোন আশ্বাসও নাই, দুরদৃষ্ট তাহাকে যে পথে টানিতেছে, সে জোর করিয়া সে পথকেই সুখের করিয়া গড়িয়া তুলিবে। বিধাতার বিধানত অমান্য করিবার যো নাই।

সুশীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শান্ত স্থির বদন হইতে পবিত্র প্রভা বাহির হইতেছিল, দেবী প্রতিমার মত ধীর স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"চল মা, খাইতে যাই।"

সরযূ সংক্ষেপে বলিল—"যাও মা, আমিও যাইতেছি।"

"যাইতেছি আবার কেন মা, এখনই চল।" বলিয়া সুশীলা কন্যার বিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"ও ঘর হইতে ঘৃতের ভাড়টা লইয়া রান্না ঘরে এস, আমি ততক্ষণ ভাত বাড়িয়া লই।" বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষুধা থাকিলেও আহারে সরযূর রুচি ছিল না। দুইগ্রাস মুখে দিতেই কেমন অবসাদ আসিয়া পড়িল, ভাতের থালা ঠেলিয়া দিয়া মুখ গুজিয়া বসিল। সুশীলা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ওকি মা, ভাত যে ঠেলিয়া রাখিলে?"

উভয়েরই কান্না আসিতেছিল, সুশীলা চাপিয়া গেলেন, সরযূ পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। সুশীলা অধীর হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন—"দুধটুকু চুমুক দিয়া খাইয়া ফেল সরযূ?"

সরযূ স্থির হইয়া বসিল, চোখ মুছিয়া ভাতের থালা টানিয়া লইয়া বলিল—"দুধ কেন আগে খাইতে যাইব, আমার যে পেট ভরিতে এখনও অনেক বাকি।" বলিয়া জোর করিয়া মুখে ভাত গুজিতে লাগিল।

সুশীলা ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, তাহার অচঞ্চল মন এতকাল পরে আজই অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাতের মধ্যে হাত রাখিয়া তিনি এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিলেন। সরযূ বলিল—"মা, কি করিতেছ, তুমি অমন করিবে ত আমিও খাইব না বলিয়া রাখিতেছি।"

সুশীলার কান্না জোর করিয়া বাহির হইয়া আসিল, সরযূর যেন সে দিকে দৃষ্টিও নাই, সে অতি আগ্রহে সেই ভাতগুলি খাইয়া বলিল—"তোমার পাতের দুটি ভাত দাও ত মা,।"

মাতা কন্যার কথা পালন করিলেন, কিন্তু মুখে হাত উঠিল না, থালার ভাত থালায় পড়িয়া রহিল। সরযূ দেখিল, কোন দিকেই তাহার শোয়াস্তি নাই। মনে মনে বলিল—"ঈশ্বর, আমারত জগতে স্থান নাই, তোমার কোলেও কি একটু স্থান দিতে পার না।"

অপরাহ্নে সরযূ ছাদের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পথের

উপরের জনতা তাহার চোখের উপর বিচিত্র চিত্রের মত ঠেকিতে-ছিল, আনন্দে হাসিতে রাস্তা যেন প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া সরযূ বলিল—"সবারই সুখদুঃখে জীবন যায়, আমারই জন্য নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সৃষ্টি হইয়াছিল।" হঠাৎ চোখ চাহিয়া দেখিল, তাহাদের বাড়ীর দোরে আসিয়া একখানা গাড়ী দাঁড়াইল, কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে সরযূ চাহিয়া রহিল, দেখিল রতন নামিয়া আসিল, পেছনে সরযূরই সমবয়স্কা একটি মেয়ে, তার পেছনে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, কাল কাল মোটা মোটা দুই তিনটা ছেলে মেয়ে বহন করিয়া একটি প্রাপ্তবয়স্কা নারী রতনের অনুগমন করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কৌতূহল দমন না করিতে পারিয়া সরযূ নামিয়া গেল।

রতন আসিয়া সুশীলাকে নমস্কার করিল। সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর বাড়ীর সবাই এল রে রতন।" রতন উত্তর না করিতেই তাহার স্ত্রী ছেলেমেয়েগুলি সুশীলার পায়ের তলায় রাখিয়া মাটিতে পড়িয়া নমস্কার করিল। সুশীলা সস্নেহ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন—"যাও মা, উপরের ঘরে গিয়া একটু জিরোও; আমি তোমাদের জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতেছি।"

দোতলা হইতে সরযূ সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। শত শত বিছা যেন সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার শরীরে দংশন করিতে লাগিল। মাতার এত অবিশ্বাস, তাহাকে পাহারা দিবার জন্যই এত কারসাজি। রতন উপরে উঠিয়া আসিতেই সরযূ

ঝঙ্কার দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ কয়দিন কোথায় গেছিলি রে রতন ?"

রতন স্ত্রীপুত্র দেখাইয়া দিয়া হৃষ্টস্বরে বলিল—"মা ঠাকরুণ যে, এনাদের আনিতে পাঠাইলেন।"

"কেন রে রতন, এত তাড়াতাড়ি সব আনিবার কি প্রয়োজন পড়িল।"

রতন হাসিয়া বলিল—"সেত আমি জানি না দিদি, আমারত ইচ্ছাও ছিল না, জানত দেশে এখন নিড়ানের সময়। তা কি করি বল, মা জোর করিয়া বলিলে আমিত আর না করিতে পারি না।"

সরযূ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কেন মাকে সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলি না।"

"তার আর বলি নাই, মাঠাকুরুণ যে বলিলেন, না আনিলেই চলিবে না।" বলিয়া রতন নিজের যে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, এবং ইহাদের আনিবার ইচ্ছা মোটেও ছিল না, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য হা করিয়া রহিল।

সরযূ বুঝিল না, অচলটা এমন কি হইতেছিল, সে ফুলিয়া অভি-মানে অপমানে আত্মহারা হইয়া উপরে গিয়া দোর বন্ধ করিল।

হঠাৎ এক সময়ে বাহিরে আসিয়া রতনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—"আচ্ছা রতন, তুইত দুটাকা মাসে রোজগার করিস, বলত এই গুষ্টীর কি করিয়া চলিবে ?"

রতন হাসিয়া বলিল—"আমি তার কি জানি দিদি, মা বলিলেন, 'সে চিন্তা তোর করিতে হইবে না, আমিই সমস্ত চালাইব।' তবেইত আমি আনিতে গিয়াছি।"

সরযূ উঠিয়া গেল, মনে মনে বলিল—"মাত পূজার খরচ বাঁচাইবার জন্য তাড়া করিয়া দেশে যাইতে চাহিয়াছিলেন।" দোর বন্ধ করিয়া আজ সে রামায়ণ ছাড়িয়া বিদ্যাসুন্দর পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া সুশীলা সরযূর জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, সরযূ আসিল না, রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল, তবু সরযূর দেখা নাই, সুশীলা উঠিয়া গেলেন, ডাকিয়া বলিলেন—"সরযূ আয় মা, জল খাবি।"

সরযূ নড়িল না, উচ্চ গলায় বলিল—"আমার শরীর ভাল নাই, আমি আজি আর কিছুই খাইব না।"

সুশীলা সেই শান্তোজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন, আর কথাটি না বলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

[২৮]

রতনের মোটা সোটা ভূতকাল স্ত্রীটির স্থান হইল সরযূর ঠিক পাশের ঘরটিতে। দিনরাত্রি অভেদে অসভ্য ছেলে মেয়েগুলির সোর-গোলে চীৎকারে সরযূ মনে মনে চটিয়া লাল হইয়া উঠিতে-

ছিল। "অবিশ্বাসের কিছু না করিতেই যদি এত লাঞ্ছনা, তবে লাঞ্ছনার সুখটুকু হইতে সে বাদ যায় কেন।"

রাত্রি বাড়িয়া উঠিলে সরযূ ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। টবের গাছে ফুল নাই, জলের অভাবে গাছগুলিও ডাটাসার হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া একটি ছোট্ট শ্বাস ত্যাগ করিল। শ্রাবণের ঘনমেঘে আকাশ অন্ধকার, যত দুর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই। সরযূর ভিতর বাহির যে ইহা অপেক্ষাও গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাহার মন মাতাল হইয়া উঠিল, বলিল—"পাপপুণ্য বলিয়াত কিছু নাই, থাকিলে আমারই বা এমন অবস্থা হইবে কেন? ভোগেই সুখ, বঞ্চনায় কেবল ক্ষতি।"

জুড়াইবার বেদনা গোপন করিবার বিশ্বস্ত নির্ভীক স্থানটি হইতে এক বিন্দু অবিশ্বাসের গন্ধ ছুটিয়া আসিয়া সরযূর হিতাহিত জ্ঞান লোপ করিয়া দিল, হায় মানুষের মন, কোন্ আঘাতে কখন যে তোমার কি ভাবের পরিণতি হইবে, তাহাত কেহ বলিতে পারে না, তুমি যে পদ্মপত্রের জলের মত অস্থির, সর্ব্বদাই টলমল করিতেছ, হেলিলেই একদিক না একদিকে গড়াইয়া পড়িবে।

সরযূ কোন প্রকারেই আত্মস্থ হইতে পারিল না, কর্ত্তব্যে কঠোর অথচ তাহার পক্ষে মর্ম্মভেদী আত্মসম্ভ্রমনাশী মাতার সস্নেহ সন্দেহ-সঙ্কুল দৃষ্টি বিষদিগ্ধ শলাকার খোচায় থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে বিঁধিতেছিল। সে কে? পৃথিবীর পক্ষে সে কতটুকু, কিসের

জন্যই বা মানুষের মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকিবে। কোন্ সুখের মোহে রমেশের সস্নেহ বহুবাঞ্ছিত শীতল ক্রোড়ের নিবীড় বেষ্টন হইতে সে তাহাকে ছিনাইয়া লইবে। মাতৃস্নেহের মত পরম পবিত্র জিনিষও তাহার ভাগ্যে বিশ্বাসহীন, কেন কি এমন অপরাধ সে করিয়াছে। অপরাধ না করিয়াও যদি এই শাস্তি, তবে কেনইবা সে আত্মবঞ্চনা করিবে। অবিচারক পৃথিবীর অযথা দৃক্‌পাতের ভয় সরযূ আর করিবে না। লোক উপহাসের হাসি হাসিবে, হাসুক, কি যায় আসে! পিপাসায় বুক শুকাইয়া গেলেও কেহত একফোঁটা জল দিবে না, অনির্দ্দেশ্য মরুর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে তৃষিত বুকে চাহিয়া থাকিতে উপদেশ প্রদান করিবে। এই অশ্রান্ত যুদ্ধ, আত্মবিস্মরণ ইহার পুরস্কার কি অবিশ্বাস, সংসারের ভোগসুখ হইতে বাহিরে আসিয়া যে ছায়াতরুর তলায় বসিয়া স্নিগ্ধ বাতাসে জীবনের অশেষ তাপ জুড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহার মধ্যেও মাতার গোপন কুটিল কটাক্ষ। সরযূ মতিচ্ছন্নের মত উচ্চ চীৎকারে বলিয়া উঠিল—"দোষগুণ ভুলিয়া তুমি আমায় বুকে তুলিয়া নেও,—আমি ধর্ম্ম চাই না, সমাজ মানি না, তোমাকে চাই, আবাল্য যে জীবন তোমারই তরে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি, অন্য কাহারও স্পর্শত তাহা কলুষিত করিতে পারে নাই, এস চিরবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা ভুলিয়া অভাগিনীর হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াও, এস প্রাণের দেবতা, আঁধার হৃদয় আলোকিত কর। তুমি চিরপবিত্র

তোমার স্পর্শে আমিও পবিত্র হইব, যদি কিছু পাপ থাকে, আবর্জ্জনার লেশও থাকে, আমারই থাকিবে, আমি তাহা মস্তকে বহন করিয়াও তোমার বুকে মুখ লুকাইয়া স্বচ্ছন্দে হাসিতে পারিব।”

পরপারের প্রাসাদ-প্রাকারে ঠেকিয়া শব্দ ফিরিয়া আসিল, সরযূ স্তম্ভিত হইয়া বুক ধরিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশের কাল কোলে পেচক বিকট চীৎকারে ডাকিয়া গেল। কণ্টকিত সরযূ ঘামিয়া উঠিল। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা লোপ পাইল, টলিতে টলিতে আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল, অজস্র অশ্রুবর্ষণে উপাধান সিক্ত করিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

ভোরের দিকে একটা সোরগোল শুনিয়া সরযূর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চোখ কচ্‌লাইয়া উঠিয়া দোর খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল বিবর্ণমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। সরযূর মন রমেশের পায়ের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল। রমেশ সংযতস্বরে বলিল—“মার বড় অসুখ হইয়াছে সরযূ, রাত্রি তিনটায় রতন আমায় ডাকিয়া আনিল, সে হইতে তিন তিন বার ডাকাডাকি করিয়াও তোমায় জাগাইতে পারি নাই।”

সরযূর নিজের উপর ভারি অভিমান হইল, মাতার অসুখ সে জানিতেও পারে নাই, অন্য পাড়া হইতে রমেশকে ডাকিয়া আনা

হইল, সরযূকেও নিশ্চয়ই কেহ ডাকিয়াছিল, সে যে ইহা টেরও পায় নাই। করুণ উদাস নেত্রে দিগ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া রহিল, পিঞ্জরাবদ্ধ নবানীত বনবিহঙ্গিনী যেমন অবাল্যবর্দ্ধিতা কুসুমকুন্তলা বনানীর কথা মনে করিয়া হাহাকার করিয়া ওঠে, অন্যসংসক্ত সরযূর মনও স্নেহকোমলা মাতার কথা মনে করিয়া তেমান হাহাকার করিয়া উঠিল। রমেশ বলিল—"চল সরযূ, মাকে দেখিবে।"

সরযূ বাহির হইয়া চলিল, রমেশের মনের উপর সে গতিভঙ্গী ক্ষীণ নির্ঝরিণীর অনাবিল মন্দীভূত গতির ন্যায় অপূর্ব্ব সুষমা, অফুরন্ত বাসনা জাগাইয়া তুলিল। রমেশ বিহ্বলের মত পেছনে গিয়া সুশীলার শয্যার কোণে বসিয়া পড়িল। সুশীলা ডাকিয়া বলিলেন—"সরযূ, আসিয়াছ মা, ওঃ বড় কষ্ট।"

সরযূর প্রাণ গলিয়া গেল, মায়ের পায়ে হাত রাখিয়া সে বালিকার মত কাঁদিয়া উঠিল।

সুশীলা বিকার জ্বরে ভুগিতে লাগিলেন, অনেক কাল পরে রমেশ আবার এ বাড়ীতে স্থান পাইল, এই ঘনিষ্ঠতায় সরযূর প্রাণও সৌন্দর্য্যে সমারোহে ভরিয়া উঠিল।

[২৯]

"কে—" বলিয়া সুশীলা তিন দিন পরে চোখ মেলিয়া চাহিলেন, রমেশ বলিল—"আমি রমেশ, এখন কেমন ঠেকিতেছে মা ?"

"রমেশ, আমার সরযূ কৈ বাবা ?"

"এই যে আমি রহিয়াছি ?" বলিয়া সরযূ আসিয়া রমেশের পাশে মাতার মাথাব কাছে বসিল। রুগ্নার চোখেও দুর্ভাবনার ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, সুশীলা আর কথা বলিতে পারিলেন না, সরযূ রমেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"তুমি ঘুমোওগে যাও।"

"না না তুমি কেন পারিবে সরযূ।" বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—"তোমার শরীর ত এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না ?"

সরয বিদ্রূপের হাসি হাসিল বলিল—"সে শরীর আমার নাই রমেশদা, এ যা শরীর হইয়াছে, না সহিতে পারে এমন কষ্ট ত দেখি না ?"

রমেশ সুশীলার মুখে জল ঢালিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"যে কষ্ট ভগবান্ দিতেছেন, তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য কারুর নাই, তা বলিয়া বোঝার ও'পর শাকের আঁটির মত ইচ্ছা করিয়া কষ্টকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়।"

সরযূ কি একটা বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। রমেশ আবার

বলিল—"তুমি ঐ পাশে শুইয়া পড় সরযূ, শরীর ত রক্ষা করিতে হইবে!"

"সেটাও তোমাদের মত আমার তত প্রয়োজনে আসিবে না, যাদের শরীর দিয়া যত প্রয়োজন, তাদের রক্ষারও ততই প্রয়োজন।

"প্রয়োজন সবারই সমান সরযূ?"

সরযূ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল—"সবারই সমান, না না সে কেমন করিয়া হইবে? তোমাদের মন সুখসৌভাগ্যের আশায় ভরপুর, নবীন জীবনে কত ভোগ সুখ করিবে, আর আমার—"

সরযূ থামিল, কথাটা শেষ করিতে পারিল না, সুশীলা আবার চোখ চাহিলেন, মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"সরযূ মা, জল।"

পরের দিন হইতে সুশীলার শরীর একটু ভাল যাইতেছিল, দুপুরে রমেশ খাইতে বসিলে সরযূ ভাতের থালা হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এখানে যে হবিষ্যি করিতে হইবে রমেশদা, জান ত এ বাড়ী হইতে মাছমাংসের কারবার উঠিয়াগিয়াছে।"

রমেশ যেন অঙ্গুলী গণিতেছিল। তাহার আকুল বাসনা, সরযূর সাহচর্য্যে দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, নিজের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা সে করিত না, সরযূর অনিষ্ট সম্ভাবনায় পালাই পালাই করিতেছিল, সরযূ ভাতের থালা রমেশের সম্মুখে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কতদিন পরে?"

রমেশ ভাতে হাত না দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, সরযূ আবার বলিল—"আর যে তোমার পাতে ভাত দিব, সে আশাত ছিল না, ভাগ্যি মার অসুখ হইল।"

রমেশ আর পারিল না, বলিল—"থাম সরযূ, কি যে বকিতেছ।"

"কি বকিতেছি ?" বলিয়া সরযূ গ্রীবা উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, স্মিত হাস্যে বলিল—"জ্বালা করিতেছে কি ? এখন আর সরযূর কথাটাও গায়ে সহে না !"

রমেশ তবু উত্তর করিল না, সরযূ আবারও বলিল—"ভাতে হাত দাও, চিরদিনের মত একবার তোমার খাওয়া দেখিয়া লই, আর হয় ত হইবে না।"

রমেশ আর পারিল না, অতিকষ্টে যে জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহা চোখ বাহিয়া পড়িতে লাগিল, ভাতের থালা ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—"কি কর" বলিয়া সরযূ পাশ ঘেসিয়া রমেশের হাত ধরিতে গেলে রমেশ এক পা পিছাইয়া গেল। সরযূ মানিল না, তাহার প্রাণ তখন লজ্জাসরম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বাহিরে একটা অনির্দ্দেশ্য বুভুক্ষায় উতলা হইয়া উঠিয়াছিল, সে রমেশের হাত ধরিল, বলিল—"ভয়ে পিছাইয়া যাও কেন দেবতা, পূজাত নিলেই না, ভোগ সাজাইয়া যে আনন্দটুকু, তা থেকে কেন আর বঞ্চিত করিবে ?"

রমেশের ললাট হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছিল। চোখ অস্বাভিক লাল, মুখে রক্তের লেশ ছিল না, সরযূর স্পর্শে তাহার শরীর থাকিয়া থাকিয়া কণ্টকিত হইতেছিল, হাত ছাড়াইয়া লইবার শক্তি রমেশের ছিল না, অতিকষ্টে—"কি কর সরযূ" বলিয়া সে পা টানিতে লাগিল, বাহির হইতে রতনের বিবাহিত বড় মেয়েটি বলিল—"মা ডাকিতেছেন।"

রমেশ হাত টানিতে গেল, সরযূ ছাড়িল না, জোর করিয়া ধরিয়া বলিল—"ভয়, কেন কিসের, এতকাল পরে যদি এতটুকুও পাইয়াছি, তবে তাহাই বা ত্যাগ করিতে যাইব কেন, ইহাই যে আমার পক্ষে দুর্ল্লভ, আমি সমাজ মানি না, নিন্দা মানি না, কাহারও মুখ চাহিবার শক্তি আমার নাই—" রমেশ কথা শেষ করিতে দিল না, জোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া অসামাল হইয়া দৌড়িয়া গিয়া সুশীলার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

[৩০]

যোগেশের মনের উপর যে বিকারটুকু আধিপত্য করিতেছিল, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে তাহাকে কমলার অভীপ্সিত কার্য্যের মধ্যে তলাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কাজের কিন্তু কোনই সুরাহা হইল না, প্রস্তাবটি প্রায় সকলের কাছেই

অদ্ভুত ঠেকিল, অনেকেই বলিল—"আরে ছিঃ, মেয়ে নাকি আবার বিবাহ না দিয়া রাখিতে পারে ?"

যোগেশ তর্ক করিতে কম করিল না, কোন ফল না পাইয়া এমনই আরও পাঁচসাত রকমের কথা লইয়া আজ সকালে আসিয়া কমলার নিকটে উপস্থিত হইল, কমলাও সবে ইন্দুমাধব-বাবুর জন্য চা প্রস্তুত করিয়া বাহিরে আসিয়াছিল, যোগেশকে দেখিয়া দাঁড়াইল। যোগেশ হতাশ্বাসের স্বরে বলিল—"এ দেশে আপনার অভিপ্রায়ের অর্থ বুঝিবে, এমন লোক ত একটিও দেখিতেছি না ?"

ইন্দুমাধব বাবু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"মা আমার পাগল, যাহা হইবার নহে, তারি জন্যে উতলা হইয়া কি করিবে ?"

কমলার মনও কদিন ভাল ছিল না, রমেশ যত দিন [illegible] করিতেছিল, ততদিন তাহার মনকে বুঝাইবার নিবৃত্ত করিবার একটা উপায় যেন ভগবান্‌ই করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেদিনও অতি কষ্টে রমেশের সেই ব্যাকুল প্রস্তাব কমলা ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এমন আর কদিন পারিবে। তাহার রমণীজীবনের যেখানে স্বার্থকতা, সেখানে প্রবেশের অধিকার পাইতে মনকে কি করিয়া বিমুখ করিবে, অথচ রমেশের অযথা নিষ্ঠুরাচরণে যে পিতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহাও সে ভুলিতে পারিতেছিল না। এলোমেলো চিন্তায় তাহার মুখ কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

তবু সে কর্ত্তব্যে দৃঢ় হইয়া বলিল—"একদিনে শ্রান্ত হইলে কাজ হইবে না, তাহা আমিও জানি। এদেশের লোক গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত, একাজ বলিয়া নহে, যখন যে কোন কাজ আপনি পাঁচজনের হইয়া করিতে যাইবেন, তখনই দেখিবেন, শতাধিক বৎসর ইহাদিগের নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্যই খাটিতে হইবে। শ্রান্তি বোধ করিয়া থাকেন ত বিশ্রাম করুন, আমার কাজের চেষ্টা আমিই করিব।"

যোগেশ অপ্রস্তুত হইল, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"চেষ্টা হইতে আমি বিরত হইব না, তার আগে যে আমাদের কিছু আয়োজনের দরকার, অর্থসংগ্রহের উপায়ত হইতেছে না।"

অর্থসংগ্রহের বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল, কমলা বলিল—"দেশে অর্থের অভাব নাই, যাঁহারা কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহারা অর্থও দিবেন, কিন্তু আপাতত—"

ইন্দুমাধব ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাজের কিছু হইবে আশা করিতে পার যোগেশ?"

কমলা উত্তর করিল—"কিছু হইবে কি না যিনি কর্ত্তা তিনিই বলিতে পারেন। আমার চেষ্টায় যাহা হইয়াছে, তাহাতে ত আশা না করিয়া পারি না।"

ইন্দুমাধব সোৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কমলা বলিল—"আমি মেয়েমানুষ হইয়া যতটা পারিয়াছি, যোগেশবাবু যে ততটাও পারেন নি, এতেই বিস্মিত হইতেছি।"

যোগেশ কথাটা বুঝিল, কিন্তু বৃথা দাম্ভিকতা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ, চুপ করিয়া রহিল।

কমলা বলিল—"আমি আশা পাইয়াছি, শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক হইলে বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যার অভাব হইবে না।"

ইন্দুমাধব আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"আপাতত আমিই এর জন্য সামান্য দান করিব, রমেশ যখন কমলার ভার লইতে স্বীকৃত হইল না, তখন ত একটা পথ আমাকেই করিয়া যাইতে হইবে। পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছ হইতে লইয়া যাইও যোগেশ?"

কমলা মাটিতে পড়িয়া ইন্দুমাধববাবুর চরণে প্রণাম করিল, ঝর ঝর করিয়া সূক্ষ্ম মুক্তাবিন্দু তাহার নেত্রনির্গত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, বলিল—"বাবা, আপনি সাহস দিন, আপনার আশীর্ব্বাদ আমার কার্য্যের সফলতা সম্পাদন করিবে।"

যোগেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, এই বৃদ্ধের প্রাণে এমন প্রশস্ত একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান লুক্কায়িত ছিল, তাহা জানিয়া সেও মাথা নীচু করিল, বলিল—"সূত্রপাতেই যখন আশাতীত সিদ্ধি, তখন নিশ্চয়ই আমরা কৃতকার্য্য হইব।" তারপর কমলার দিকে চাহিয়া একটি ছোট শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"গঙ্গার ধারে বাড়ী একটি ঠিক করা হইয়াছে। দুজন প্রাচীন পণ্ডিতও সামান্য মাহিনায় যথাসাধ্য পরিশ্রমে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

কমলার হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠিল, সে হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিল—"যোগেশবাবু, আপনি আমার ভ্রাতার কাজ করিতেছেন, অসম্ভব বলিয়া যদি কোন আঘাত আপনাকে করিয়া থাকি ত ভগিনী বলিয়া ক্ষমা করিবেন।"

যোগেশ কথা বলিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ইন্দুমাধব কাতর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করিলে মা?"

কমলা সে কথার উত্তর করিল না, কন্যার মত ইন্দুমাধববাবুর হাত ধরিয়া বলিল—"চলুন বাবা, আপনার চা যে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

বেলা চারিটা বাজিতে রমেশ আসিয়া ডাকিল—"কমলা?"

কমলা তখন ইন্দুমাধববাবুর পাকা চুল তুলিতেছিল, রমেশের স্বরে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"যাই বাবা, রমেশবাবু হয়ত না খাইয়াই আসিয়াছেন, জানেনত তাঁর কেমন ধারা।"

ইন্দুমাধব দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন, রমেশের ব্যবহার তাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিতেছিল, কথা বলিতে পারিলেন না।

কমলা আসিয়া দাঁড়াইতেই রমেশ বলিল—"ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি, কিছু খাইতে দিতে হইবে।"

কমলা সে ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে পারিল না, দৌড়িয়া রান্নাঘরে গিয়া সশব্দে আসন ফেলিল, একটা বন্ধনের

আনন্দে যেন তাহার হাত-পা বড় জোরে চলাচল করিতেছিল, এমন করিয়াত রমেশ তাহার নিকট আর কোন দিন আহার্য্য প্রার্থনা করে নাই। ভাত আনিয়া দেখিল, রমেশ আসনে বসিয়া পড়িয়াছে। কমলা ভাতের থালা সম্মুখে রাখিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে শ্বাস ত্যাগ করিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মা কেমন আছেন!"

শতস্মৃতি যেন সহস্র দন্ত বাহির করিয়া রমেশকে কামড়াইতে উদ্যত হইল, সরযূর হাতের ভাত ফেলিয়া কি ভাবে রমেশ উঠিয়া আসিয়াছিল মনে পড়িতে হাত অবসন্ন হইয়া গেল। সরযূ ত অনাহারে রহিয়াছে, হায় হতভাগিনীর যে পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। রমেশ যেন ভাত গণিতেছিল, কমলা চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা কি ভাল নাই, রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কি?"

"ভাল আছেন—" বলিয়া রমেশ অন্যমনস্কভাবে আসন ছাড়িয়া উঠিতেছিল, কমলা বিস্মিত হইল, ততোঽধিক চিন্তিত হইয়া বলিল—"কি করিতেছেন রমেশবাবু, ভাতে হাত না দিয়াই উঠিয়া চলিলেন।"

রমেশের কাণের কাছে সরযূর আর্ত্তকণ্ঠের ধ্বনিটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, কণ্ঠ শুষ্ক, মুখ পাংশুবর্ণ, চরণ ঈষৎ কম্পিত, উন্মত্তের স্বরে বলিয়া উঠিল—"খাইতে ত আমি পারিব না কমলা, সরযূ যে আমারই জন্য উপোষ করিয়া রহিয়াছে।" বলিয়াই রমেশ

জলাতঙ্কের রোগী জল দেখিলে যেমন মূর্চ্ছা যায় তেমনি কমলার কাল মুখ দেখিয়া মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া পড়িল।

কমলা একটু দ্বিধা করিল না, একবার ভাবিল না, সমস্ত সঙ্কোচের জড়তা কাটাইয়া দিয়া রমেশের মাথা হাটুতে তুলিয়া লইল, পরিধেয় বসনের অঞ্চলে বাতাস করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে রমেশ চোখ মেলিয়া চাহিল, সহসা কমলার হাত ধরিয়া ফেলিল,—"কমলা আমায় আশ্রয় দাও, বাচাও, পাপের পথ হইতে টানিয়া আন, আরত কেহ পারিবে না। নিতান্ত যদি অসমর্থ হও, আমার দুঃখের ভার বহন করিয়া আমাকে হাল্কা করিয়া লও।"

দিনান্তের বায়ু মৃদু বহিতেছিল, পাশের গয়লাবাড়ীর বৎসহারা গাভীটা ডাকিয়া উঠিল। কমলা উত্তর করিতে পারিল না, নিঝোরে চোখের জল ঝরিয়া পরিয়া রমেশের উত্তপ্ত ললাট শীতল করিয়া তুলিল। পিতার শেষ স্মৃতি সবলে আঘাত করিয়া কমলার মনের উপর হাহাকার পাকাইয়া তুলিল।

[৩১]

রমেশ চলিয়া গেলে সরযূ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, উপেক্ষা, অপমান, ব্যর্থতার বিপুল নৈরাশ্য জলন্ত লৌহ শলাকার মত তাহার অন্তরের অভ্যন্তরভাগ পোড়াইয়া দিতে-ছিল, আলোড়িত মথিত হৃদয় হইতে নাই নাই শব্দ যেন পৃথিবী কম্পিত করিয়া জলস্থল আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া হাহাকার জুড়িয়া

দিল। যতদূর দৃষ্টি যায়, যেন তরঙ্গায়িত রক্ত নদী, তীরভূমির খোজও নাই, অফুরন্ত অতলস্পর্শী রক্ত, ছুইবার উপায় নাই, তৃষায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। সরযূ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রতনের মেয়েটি গিয়া পাশে দাঁড়াইল, কাতরস্বরে ডাকিল—“দিদি ?”

“দিদি” একি কোমল মধুর আহ্বান, বালুকাময় মরুতে স্বচ্ছজলপ্রবাহ, সরযূর কান্না এবার সম্মুখের সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া পূর্ণ শক্তিতে শব্দিত হইতে লাগিল।

মেয়েটি সরযূর হাত ধরিল, বলিল—“কাঁদিয়া কি করিবে দিদি, অদৃষ্টের দোষত কান্নায় কাটান যায় না।”

সরযূ বিস্মিত হইল, গ্রাম্য মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া তাহার হাতখানা সবলে টানিয়া আনিয়া বুকে রাখিল। আগন্তুকার ডাগর সরল চোখ দুটি যেন সরযূর কাতরতা দেখিয়া ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। সরযূ আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করিল, অতিকষ্টে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল,—“তোমার নামটি কি বোন ?”

এই গ্রাম্য অশিক্ষিত মেয়েটির প্রতি সরযূর ঘৃণা ও রাগের অভাব ছিল না, মুহূর্ত্তে কি পরিবর্ত্তন; ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতে সরযূ আজ আর দ্বিধা বোধও করিল না। মেয়েটি সংক্ষেপে উত্তর করিল—“সোণামণি।”

সোণামণির হাত ধরিয়া সরযূ শয্যার উপর বসিল, জিজ্ঞাসা

করিল –"অদৃষ্ট সম্বন্ধে তোমার এত জ্ঞান কি করিয়া হইল সোণা ?"

সোণা চোখ তুলিয়া চাহিল, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"জ্ঞান আর আমার কৈ দিদি, আমিত মূর্খ, দুঃখের কথা উঠিলে লোকে যে ঐ কথা বলিয়া প্রবোধ দেয়।"

আহা কি মিষ্টি, অশিক্ষিত হওয়া বরং ভাল, কত উদার মন, পবিত্র চরিত্র, আপন মুখে কে এমন বলিতে পারিবে, "আমি মূর্খ ; কিছুই জানি না, লোকের মুখের কথা শুনিয়া শিখিয়া রাখিয়াছি।"

সরযূ আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কাহার দুঃখের কথা বলিতেছ সোণা, তোমার কি ?"

সোণা জবাব দিল না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সরযূর দিকে চাহিল, সরযূ বুঝিল, সোণার নির্ম্মল প্রাণ কি একটা গুরু যাতনায় ব্যথিত হইতেছে, সহসা উচ্ছ্বলিত আবেগে সরযূ জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় বলনা সোণা, আমি যে তোমার দিদি।"

সোণা আর না করিতে পারিল না, বলিতেও যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, অতি কষ্টে উত্তর করিল, "—"আর একদিন বলিব।"

সরযূ ভাবিল, তাইত, স্বামিপুত্র থাকিলেই লোক সুখী হয়, এ ধারণাটা তাহার কাছে কেমন সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়িল। সোণা বলিল—"মা তোমায় ডাকিতেছিলেন দিদি ?"

সরযূর যেন ধ্যান ভাঙ্গিল, মাতার কথা মনে হইতেই ভাবিল,—

"আমি কি নিষ্ঠুর, নিশ্চয়ের পিছন ছাড়িয়া অনিশ্চিতের জন্য ছুটিয়া চলিয়াছি। ভাল যাহা, তাহাই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছি।"

সরযূ উঠিল, সহসা রমেশের কথা তাহার মনে পড়িল, পা বাড়াইতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, আবার চলিল, বলিল—"চল সোণা, মাকে দেখি গিয়া।"

সুশীলা বালিশে ভর রাখিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন—"এস সোণা।" বলিয়া সরযূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সরযূ শুনিয়াছ মা, সোণার দুঃখের কথা।"

সরযূ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, সুশীলা বলিলেন—"সোণার স্বামী সোণাকে দেখিতে পারে না, দুশ্চরিত্র, ঘরেও থাকে না, কোনদিন আসেত অত্যাচার করে, মারপীট করিয়া চলিয়া যায়, মার আমার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।"

সরযূ বালিকার মত জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা এমন করে, সোণা কি তার প্রতি কোন অন্যায় করিয়াছে?"

"এ যে আমার সোণার মেয়ে, ওর কি কোন অন্যায় হতে পারে মা, আমি দুদিনেই মাকে আমার চিনিয়া লইয়াছি।"

"তবে"—বলিয়া সরযূ উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিল। সুশীলা বলিলেন—"ভাগ্যের ফলত ভগবান্‌ও খণ্ডন করিতে পারেন না, যেমন অদৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তেমনি ভোগ করিতে হইবে।"

সরযূ নিজের অজ্ঞাতেই যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ভাগ্যের

এমনতর দৃষ্টান্তত জগতে বিরল নহে, তবু সে নির্ভর করিতে পারে না কেন ?"

রমেশ ঘরে ঢুকিল, একটু হাসিয়া বলিল—"তোমার এ পাগল ছেলে মা, আজ আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া পলাইয়া ছিল। কোন অসুবিধাত হয় নাই ?"

সরযূ বুক চাপিয়া ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুশীলা বলিলেন—"না রমেশ, আমার ত কোন কষ্ট হয় নাই, এখন আছিও ভাল, তুমি পুরুষ মানুষ, এমন আর কতদিন বসিয়া থাকিবে, কাজকর্ম্মত রহিয়াছে।"

রমেশ ম্লান হাসি হাসিল, যেন মেঘান্তরিত শ্রাবণের আকাশ। বলিল—"কাজত তোমার রমেশ অনেক করে, ক্ষতিবৃদ্ধির ধার আমি ধারিনা মা, মন মানে না বলিয়াই ছুটিতে হয়।"

"চল সোণা, আমরা ছাদে যাই।" বলিয়া সরযূ সোণার হাত ধরিয়া উঠিয়া গেল।

ছাদে আসিয়া সরযূ এ-কথায় সে-কথায় অতি অল্পকালের মধ্যেই সোণার নিকট আত্মীয় হইয়া উঠিল, সোণাও একটা আশ্রয় পাইয়া হৃদয়ের ভার হাল্কা করিতে দ্বিধা করিল না, কথায় কথায় সরযূ জানিয়া লইল, রতন কুলীন কায়স্থের ছেলে, অবস্থাদোষে তাহাকে এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, বৃত্তি যাহাই হউক, অর্থ থাক না থাক, কন্যাবিবাহ ত সমান ঘরে না দিলে হইবে না, বাধ্য হইয়া

রতনকে যাহার বিবাহই হয় না, এমন ছেলে খুঁজিতে হইয়াছিল, জানিয়া শুনিয়াই সে একটি মদ্যপ দুশ্চরিত্র অমানুষের হাতে কন্যাকে অর্পণ করিয়াছে। সোণা ভাল মেয়ে, অনেক লাঞ্ছনাগঞ্জনা সহ্য করিয়াও স্বামীর প্রতি ভক্তিহারা হয় নাই, এই অল্প বয়সেই সে যেন প্রাচীন হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহার একটিমাত্র আশা, সে আসন্ন-প্রসবা, সোণা ভাবী আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। সরযূ কথাগুলি মন দিয়া শুনিল, তাহার হৃদয়ের গোপনীয়তম প্রদেশের আঁধারটা সোণার এই স্বামিভক্তির একনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা যেন অনেকটা কাটাইয়া তুলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা সোণা, রতন কি তোর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করিতে পারিত না?"

সোণা জিভ্ কাটিল, বলিল—"সে কি দিদি, ওকথা ভাবাও যে পাপ, আর দোষই কার বলত, আমার যদি শক্তি থাকিত, তবে কি তাঁকে ফিরাইয়া আনিতে পারিতাম না।"

সরযূ অবাক্ হইয়া গেল, বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"বিবাহ যদি নাই হ'ত সোণা?"

"সে যদি হইবার যো থাকিত ত মন্দ ছিল না, কিন্তু সে যে হতে পারে না, একটা ব্যবস্থা না করিলে বাবা যে সমাজে উঠিতে পারিতেন না।"

সরযূ একান্ত আক্রোশে ফুলিয়া উঠিল—"সমাজের এমন জোর জবরদস্তি কেন, মেয়ে হইলেই ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, এ নিষ্ঠুরতা

মেয়ের বাপেরও ঘোচে না, এমনই অপদার্থ আমাদের দেশের পুরুষগুলি। ছিঃ ছিঃ, এরা দাম্ভিকও কম নয়, নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দম্ভ করিতে এক মুখ যেন শতমুখে পরিণত হইয়া উঠে।”

সোণা বলিল—“তাতে দোষ কি দিদি, অমিত বেশ আছি, কেবল দুঃখ যে দিনান্তে একবার দেখিতে পাই না।” সোণার চোখ ম্লান হইয়া আসিল, বেলা পড়িয়া আসিলে পশ্চিমের সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়া অভিমানে ক্ষোভে রক্তরাঙ্গা হইয়া পৃথিবীর উপর আবির ছড়াইয়া দিতেছিল। হাল্কা বাতাস পদ্মপরাগের গন্ধ লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সরযূ ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিল, নিজের মনে বলিয়া উঠিল—“হা হতভাগ্য দেশ, এমন রত্ন তোমরা চিনিতে পারিলে না।” থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিল—“সোণার মত নির্ভরতা যার আছে, সেইত সুখী, ভগবান্, কি করিলে এমন নির্ভরতা লাভ করা যায়?”

[৩২]

সুশীলার শরীর সারে সারে সারে না, অশান্তির গাঢ় ছায়া বিধবা ব্রহ্মচর্য্যলোলুপার মুখখানাকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল. পথভ্রান্ত পথিকের মত কন্যার মনোভ্রম তাহাকে ব্যাকুল চিন্তায় বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। নৈপুণ্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া সুশীলা

বুঝিয়াছিলেন, সরযূর চিত্তজয় করিবার চেষ্টাটা একাগ্রতার অভাবে আকুল বাসনার জোরে স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়ই ভাসিয়া চলিয়াছে। ঘোর বিকারগ্রস্ত রোগীর মত প্রতিকারক ঔষধে প্রতিসিদ্ধ রোগ যেন অনাচারের মুখে কুপথ্য পাইয়া বাড়িয়াই উঠিতেছিল, কি করিবেন, কি করিলে এই সঙ্কটময় ব্যাধির হাত হইতে বড় আদরের রোগীটিকে রক্ষা করিতে পারিবেন, এই চিন্তার ভার অন্যের অগোচরে তাহাকে ক্ষয় করিতেছিল। সে দিন তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সরযূ একান্তমনে বিষবৃক্ষের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সুশীলা জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন, যেমন করিয়া হউক, শরীর সবল না করিলেই নহে, সরযূকে বলিলেন—"মা রতনকে বলিয়া দাও, একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনে, অনেকদিন কোথাও বাহির হই নাই, আজ মদনমোহন দেখিয়া বাবার পায়ে নমস্কার করিয়া আসিব।"

সরযূ কুন্দের প্রাণমাতান প্রেমের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিল, মাতার কথা তাহার কাণেও গেল না। সুশীলা আবার ডাকিলেন —"সরযূ যাও মা, কথা শোন।"

সরযূ যেন কিছুই শোনে নাই, এমনই ভাবে জিজ্ঞাসা করিল— "কি মা ?"

"রতনকে বলিয়া আসিবে, একখানা গাড়ী আনিয়া দেয়, মদনমোহন দেখিতে যাইব।"

"যাইতেছি।" বলিয়া সরযূ স্বকার্য্যে মন দিল।

সুশীলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নীরবে রহিলেন।

আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, সরযূ নড়েও না, একবার ফিরিয়াও চাহে না, সুশীলা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোর কি যাবার সময় হয় নি সরযূ, আমায় যে এখুনি বাড়ী হইতে না বেরুলে চলিবে না।"

অতি অনিচ্ছায় সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"তোমার যেমন সময় অসময় নাই, যখন যাহা ধরিবে, তখনই তাহা করিয়া তবে ছাড়িবে।" বলিয়া সরযূ চলিয়া গেল, সুশীলা অবাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রতন আসিয়া বলিল—"মা ডাকিলেন, মদনমোহন দেখিতে যাইবে, চল।"

সরযূ ভ্রূকুটি করিল, বলিল—"বল গিয়া মাকে আমি ব্যস্ত আছি, যাইতে পারিব না।"

রতন গিয়া সংবাদ দিতে সুশীলা অপ্রতিকার্য্য ব্যাকুলতায় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, নিজে আসিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন—"সরযূ, তোমায় যে মা যাইতেই হইবে, রোগের শরীর বহিয়া আমিত একা যাইতে পারি না।"

"সোণাকে সঙ্গে নেও।" বলিয়া কন্যা অন্যমনস্কের মত পুস্তকের পাতার মধ্যে চোখ দিয়া রহিল।

ধৈর্য্যের প্রতিমা সুশীলারও আজ কেমন মতিভ্রম হইল, আর সামলাইতে পারিলেন না, বলিলেন—"কাজ ত তোমার এমন কিছু নাই সরযূ, বৃথা পড়িয়া পড়িয়া ঐ যা তা বইগুলি পড়িবে, রামায়ণ-মহাভারতে মন যায় না কেন বলত?"

সরযূ উদ্ধত ভাবে তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল—"কি যে বলিতেছ, মাথামুণ্ডু বুঝিবার যো নাই, বঙ্কিমবাবুর লেখা বই, তোমার কাছে হল কি না যা তা।"

"বুঝিলাম।" বলিয়া সুশীলা থামিলেন, একটু চিন্তা করিয়া সংযত স্বরেই বলিলেন—"ওসব বই বিধবাদের পড়িতে নাই মা, হিন্দু-বিধবারা যে রামায়ণ মহাভারতই পড়িয়া থাকে—"

সরযূ বাধা দিল, বলিল—"এমন কোন শাস্ত্রের বিধি আছে, তাহাত আগে জানা ছিল না।" বলিয়াই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কি বলিতে গিয়া যে কি কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিয়া তাহার উত্তপ্ত উদ্ধত মনও নরম হইল, কিন্তু সে পুস্তক ছাড়িয়া উঠিল না।

সুশীলার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, রতন আসিয়া বলিল —"গাড়ীত আর দাঁড়াইতে চাহে না।"

সরযূ তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"বিদায় করিয়া দে,

এমন হতভাগা গাড়োয়ানও ডাকিয়া আনিয়াছিস যে, একমিনিট সময়ে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।”

রতন অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—“সরযূ, তুমি যাবে কি না, তাহাই জানিতে চাহি।”

“যদি না যাই?” বলিয়া সরযূ মুখ নামাইল। সুশীলা ধীর-পদে মরা মনে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সোণামণি আসিয়া বলিল—“দিদি, একি ভাল হইল, মা যে মনে কষ্ট পাইবেন।”

সরযূ পুস্তক ছাড়িয়া উঠিয়া ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার একি হইয়াছে, মা যে মনে কষ্ট পাইবেন, তাহাত এতগুলি কথা, এতটা সময়ের মধ্যে একবারের জন্যও বুঝিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ পরে বলিল—“চল সোণা!” বলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সুশীলা চলিয়া গিয়াছেন।

মদনমোহনের দ্বারে লোটাইয়া পড়িয়া সুশীলা কাতর মনে প্রার্থনা করিয়া লইলেন—“প্রভু, সরযূ আমার বালিকা, ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, তুমি ওর দোষ ক্ষমা করিও, মা যেন সন্তাপ হারাইয়া তোমার পায়ে দেহমন সমর্পণ করিতে পারে।”

রতন স্ত্রীপুত্র লইয়া আসা অবধি তাহাদের পাক নীচের তলায় হইত, সোণামণি ও তাহার মাতা পাককার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সরযূ একাকী ছাদে পাইচারী করিতেছে। সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব নাই, অবসন্ন কর ছড়াইয়া দিয়া সূর্য্যদেব পশ্চিমদিগের সীমন্ত

অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। হোমশিখার মত উজ্জ্বল লাল জ্যোতিঃ অর্দ্ধাকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। রাঙ্গা দীপ্তিতে আলো করিয়া প্রকৃতি ছাদের উপর ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। রমেশ দোতলা শব্দিত করিয়া ডাকিল—"মা।" কেহ সাড়া দিল না, রমেশ ভাবিল—"তাইত, অসুখ শরীর লইয়া মা কোথায় গেলেন।" অনেক দিন পরে আজ তাহার সেই ছাদে বেড়াইবার কথা মনে পড়িল। এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ছাদে গিয়া উঠিল, দেখিল, সরযূ একদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল—"মা কোথায়?"

সরযূ জবাব দিল না। সংশয়পূর্ণ চিত্তে রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখানে দাঁড়াইয়া কেন সরযূ?"

মুহূর্ত্তে সরযূ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—"মা মদনমোহন দেখিতে গিয়াছেন।"

"তুমি যে বড় যাওনি?"

উৎসাহ নিবিয়া গেল, ধরা গলায় বলিল—"যাইনি সে আমার ইচ্ছা, জবাবদিহি করিতে করিতে প্রাণ যে থাবি খাইতেছে।"

রমেশ দেখিতেছিল, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সরযূর কেমন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। বিধবা হইবার পর হইতে তাহার যেন বুদ্ধির ঠিক নাই। বিকৃত মস্তিষ্ক রোগীর মত একবার এদিক্ একবার ওদিক্, এমনি

ভাবেই তাহার বুদ্ধি টলিতেছিল। সংশয়সঙ্কুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"দিন দিন তুমি একি হইতেছ সরযূ?"

অসহায় ক্রোধে সরযূর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল—"এমন কিছুত দেখি না।"—বলিয়া মুখ বাঁকাইল।

রমেশ বিচলিত হইয়া বলিল—"মার সঙ্গে তোমারও যাওয়া উচিত ছিল, দেবদেবীদর্শনে মনের পবিত্রতা জন্মে।"

সরযূ আগুন হইয়া উঠিল—"আমার অপবিত্রতা লইয়া আমি থাকিব, তোমাকে পাইবে না, বাতাস লাগিলে পাছে পচিয়া মর, ভয়ে ত সেদিন পলাইয়া গেলে।"

"সরযূ"—বলিয়া রমেশ নিবৃত্ত হইল, নিজের উপর ভরসা করিয়া আর কথাটি বলিতে পারিল না।

সরযূ বলিল—"তোমরা আমায় যাহাই বল না কেন, আমার কাজ আমি করিব। যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু মনকে বোঝাইতে পারিলাম না! পাপপুণ্যের কথা ভাবিয়া যখন কোন উপায় নাই, তখন ও বিচার ছাড়িয়া দিব, আস্তিকে নাস্তিকে মেসামেসি অপেক্ষা বরং নাস্তিক ভাল, অন্ততঃ তাহার বলিবার মত কিছু থাকে।"

"আমি মনকে বোঝাইয়াছি।" বলিয়া রমেশ সরযূর মুখের দিকে তাকাইতেই সরযূ ছিট্‌কাইয়া উঠিল, বলিল—"তোমাদের বোঝাবুঝিতে ত কষ্ট নাই, বাগানের ভোমরার মত একটা

ত্যাগ করিবে, আর একটা আশ্রয় করিবে, কুলেরও ত অভাব হয় না।"

"বাধ্য হইয়া হয়ত আমাকে তোমার এ অনুযোগই মাথায পাতিয়া লইতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলাম, ভালবাসাকে বিকৃত করিয়া কেবল জগতের কাছে অপরাধী হইয়াই পার পাইব না, মনের কাছেও বড় কড়া আঘাত সহ্ করিতে হইবে।" বলিয়া রমেশ নীচে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

সরযূ ডাকিল—"শোন?"

রমেশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার কষ্টসংযত মন যেন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, বাতাস পাইয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলিবে বল সরযূ?"

"কিছুই কি মনে পড়ে না?"

"পড়ে।" বলিয়া রমেশ একপা সরিয়া দাঁড়াইল। সরযূ বলিল,—"এই আকাশ, এই বাতাস, এই ছাদে দুইজনের প্রাণ-বিনিময়।"

রমেশের বক্ষঃ-শোণিতে ঢেউ খেলিতে লাগিল, সে প্রাণপণ বলে আপনাকে আকড়িয়া ধরিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"সে কথা আবার কেন?"

সরযূ আর সাম্‌লাইতে পারিল না, উত্তেজিত বিহ্বল কণ্ঠে বলিল—"কেন, জানি না, জানাইবার শক্তিও আমার নাই।

সাহারার পথভ্রান্ত পথিকের মত আমি যে ক্ষুধাতৃষ্ণায় শুকাইয়া মরিতেছি।"

"ভগবান্‌কে ডাক সরযূ?"

সরযূর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, "ডাকাডাকির ধার আমি আর ধারিব না, চেষ্টা যা করিবার করিয়া দেখিয়াছি, ভাবিয়া দেখ, তোমার লুব্ধ অন্তরকে আমিই আঘাত করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। আর আমার সাধ্য নাই, তাই আজ এই মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত বাতাসে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—"

সরযূর কথা সমাপ্ত হইতে পাইল না, সুশীলা দূর হইতে দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কি জিজ্ঞাসা করিতেছ সরযূ?"

রমেশ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সুশীলা তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন—"আমি সব শুনিয়াছি রমেশ, তুমি পারিবে, দেবতার আশীর্ব্বাদ তোমায় জয়ী করিবে, এস।" বলিয়া সরযূর দিকে চাহিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন—"সরযূ মা, ভুলকে বাড়িতে দিও না, আমি তোমার মা, আমার মত আপনারত আর কেহ নাই, আমি যাহা বলিব, তাহা তোমার মঙ্গলের জন্য, একথা একদিন যেমন বুঝিয়াছিলে, চিরদিন তেমনি বুঝিতে চেষ্টা করিবে।" বলিয়া রমেশকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

সরযূর কাণের কাছে, মুক্ত বাতাসটা যেন উপহাসের হাসি হাসিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিতে লাগিল।

[৩৩]

কমলা স্নানের জন্য কলতলায় যাইতেছিল, ইন্দুমাধব প্রবেশ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—শুনিয়াছ মা, ও-পাড়ার নিমাই বোসের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, একটিমাত্র মেয়ে, কাল রাত্তিরে ক্রাসিন মাখিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিল! ভদ্রলোক ধনেপ্রাণে মারা গেল, পুলিস আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।"

কমলা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল, মুহূর্ত্তে ঠিক করিয়া লইল, নিমাই বোসকে যে ভাবে হউক বাঁচাইতে হইবে। ধীরে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মরিল, কিছু শুনিয়াছেন কি?"

"আর কেন, রোজ যা ঘটিতেছে। নিমাইবোস প্রাণান্ত করিয়া কন্যাবিবাহের কিছু করিতে পারে নাই। মেয়ে বড় হইয়াছে; জ্ঞাতিকুটুম্ব পাঁচজন কাল সন্ধ্যায় বলিয়া গেল, 'আর তোমাকে লইয়া সমাজে আহারব্যবহার চলিবে না,' মেয়েটা তাহাই শুনিয়া পিতার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে।"

"হা হতভাগ্য সমাজ।" বলিয়া কমলা মনে মনে বলিল—"এমনটারই এখন প্রয়োজন, মহাবলি ভিন্নত সমাজের ঘুম ভাঙ্গিবে না। সর্ব্বনাশ সহ্য করিবে, তবু কন্যা ঘরে রাখা বরদাস্ত করিতে পারিবে না।" ইন্দুমাধবকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"আপনার

কি এখনও এই মত বাবা যে, এমনি অত্যাচার চলিতে থাকুক, আমরা কোন প্রতিবিধানই করিব না।”

“দাম্পত্যবন্ধন না থাকিলে যে সংসার থাকিবে না মা ?”

“আবার আপনি সেই পুরণ কথাই বলিতেছেন। দাম্পত্য-বন্ধন থাকিবে না, কে বলিতেছে। বিবাহ না দিয়া রাখিতেই হইবে, এমন কথা কি কেহ বলিতে পারে। আমার উদ্দেশ্য, চেষ্টা প্রাণপণে করুন, যদি নাই পারেন ত এমনটা ঘটাইবেন না, পিতা-মাতার জাতি যাইবার ভয়ে যেন কন্যাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাতক না করিতে হয়। পিতামাতা যখন নিতান্ত অবুঝ হইবেন, তখনও আমরা আত্মহত্যায় তাহাদিগকে মুক্ত না করিয়া মনের বলে অন্য আশ্রয়ের অন্বেষণ করিয়া নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার শক্তিতে ঘর ছাড়িয়া পরকে আশ্রয় করিয়া পিতামাতাকে মুক্তি দিতে পারিব।”

“একটা কোন উপায় হইলেই যে পিতামাতা উদাসীন হইবেন।”

“সেজন্য ত কাহাকেও দায়ী করা চলে না, বিধিলঙ্ঘন করিবার ভয়ে বিধানকর্ত্তার দণ্ড হইবে, এমন বিচারের উপায় নাই, শাক না খাইয়া ঘৃত খাওয়া ভাল, ইহা জানিয়াও সহজলভ্য শাকে সন্তুষ্ট হইয়া যাহারা ঘৃতের সন্ধানে বিরত হইবেন, তাঁহাদের কথা আলাদা, তেমন মানুষের জন্য কোন বিধানেরও সৃষ্টি হয় নাই। ঐ রূপ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি সমাজ ও সামাজিক তন্ত্রের বাহিরে।”

যোগেশ আসিয়া দাঁড়াইল, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিল—“না, এদেশে এসব কাজ করিবার সাধ্য নাই।”

কমলা উৎকণ্ঠিত ভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিল—“ঠিক হইবে যোগেশবাবু, হোমের ধূমায়িত অগ্নি যে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আহুতিরও অভাব হইবে না, মায়ের মেয়েরাই মাতৃপূজার আহুতি যোগাইতেছে। আগে কিন্তু আমাদের হোমকর্ত্তাকে রক্ষা করিতে হইবে।”

যোগেশ কিছু বুঝিল না, অব্যক্ত সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিল—“কিসের কথা বলিতেছেন?”

নিতাইবোসের কন্যার আত্মহত্যার কথা সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করিয়া কমলা বলিল—“এই নিতাইবোসকে আমাদের রক্ষা করিতে হইবে, আপনি আপাতত তাহারই চেষ্টা দেখুন, যাহাতে অত্যাচার অবিচার তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে না পারে, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। ভবিষ্যতে ইহাদ্বারা আমরা অনেক কাজ পাইব।”

যোগেশ বলিল—“চেষ্টা আমি যথাসাধ্য করিব, এদিকের অবস্থা শুনিয়া ইহার জন্যও যাহা হয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

কমলা জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল, যোগেশ বলিয়া চলিল—“যে দশটি মেয়ে আপনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারা এই

প্রাচীন অধ্যাপককে গ্রাহ্য করিতে চাহে না, বরং অবজ্ঞা করে, এভাবের শিক্ষা নাকি তাহাদের উপযুক্ত নহে।"

"ব্যস্ত হইবেন না যোগেশবাবু।" বলিয়া যোগেশকে আশ্বস্ত করিয়া কমলা উপায়চিন্তায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। রমেশ ঢুকিয়া অবাধকণ্ঠে বলিল—"বাবা, আমিত বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কমলার মত করিয়া তুমি এখন বিবাহের আয়োজন কর।"

যোগেশ মৃদু আঘাত পরিপাক করিয়া লইয়া মাথা নীচু করিল। ইন্দুমাধব হর্ষগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"কমলার মত আবার কি করিতে যাইব, ওযে তোমারই জন্য রহিয়াছে।" আহ্লাদে ইন্দুমাধব কমলার মুখের দিকে চাহিলেন। কমলা ধীর কণ্ঠে উত্তর করিল—"আপনার আজ্ঞা আমি পারত পক্ষে লঙ্ঘন করিব না, আমায দুদিন ভাবিতে দিন।"

যোগেশ কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিল, বলিল—"আমি চলিলাম, দেখি কতদূর কি করিতে পারি? তাহার আগে আমারও আপনার নিকট অনুরোধ, এ বিবাহে আপনি অমত করিবেন না।"

কমলা মনে মনে যোগেশের প্রশংসা করিল, বলিল—"আপনার অনুরোধও আমার কাছে ফেলিবার নহে, কিন্তু আরব্ধ কার্য্যের সফলতাই আমাদের জীবনের ব্রত মনে রাখিয়া কার্য্য করিবেন।"

সহসা সুশীলা আসিয়া কমলার হাত ধরিলেন, কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"লক্ষ্মী মা আমার, তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি প্রাণ

দিয়া চেষ্টা করিব, তোমায় মা আমার কথা রাখিতে হইবে, বিবাহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।”

কমলা পায়ে পড়িয়া সুশীলাকে নমস্কার করিল, মুখ তুলিয়া বলিল—“তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা, আমি যেন আমার মনের ক্ষোভ ভুলিতে পারি, বিবাহ কি, তাহাত তোমার অবিদিত নাই, মনের বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস যে গোচনার মত ভারের দুগ্ধ নষ্ট করিয়া দিবে, তাহা আমি হইতে দিতে চাহি না, মন পরিষ্কার করিয়া যেন তোমাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারি।”

প্রাতষ্ঠিত বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিয়া কমলার উদ্বিগ্ন মন স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রধান পণ্ডিত মহাশয় উচ্চ গলায় কি বলিতেছেন, প্রথমটা তাহার হৃদয়ঙ্গমই হইল না, অনেকক্ষণ পরে পণ্ডিত একটু শান্তভাব অবলম্বন করিলে কমলা সাহস সঞ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি হইয়াছে, আপনি এমন ক্রুদ্ধ হইলেন কেন?”

শিক্ষক কমলাকে সম্ভ্রম দেখাইলেন, বলিলেন—“দেখত এই মণিবাবুর কাণ্ডটা, যক্ষ কৃপণ, টাকা খরচ হইবার ভয়ে কন্যাটিকে অপাত্রে অর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে।”

মণিবাবু হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা তিনি যেখানে যেমন ইচ্ছা বিবাহ দিবেন, তোমরা কে! কন্যার উপর তাঁহার

বড় রাগ হইল, পিতার অবাধ্য হইয়া সে যদি ইহাদের এখানে আসিয়া উপস্থিত না হইত, তবে ত আর কোন কথাই হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিলেন—"আমার মেয়ের ভালমন্দ আমি বুঝিতে পারি না, অন্যের উপদেশ লইয়া তবে আমায় কাজ করিতে হইবে, কেন এমন কি দায়ে পড়িয়াছি !"

কমলা ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিল—"শুনিয়া সুখী হইলাম, এ ত যথার্থ কথা, মেয়ে আপনার, তাহার ভালমন্দ আপনি বুঝিবেন নাত কে বুঝিবে, পণ্ডিত মহাশয় হয়ত কি শুনিতে কি শুনিয়া থাকিবেন।"

পণ্ডিত মহাশয় কথাটা ঘাটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার স্থিরীকৃত পাত্রটির পরিচয় ইহার কাছে বলিতে পারেন না !"

"কেন পারিব না ?" বলিয়া মণিবাবু থামিলেন, কমলা তাহার কুণ্ঠা দেখিয়া বাধা দিল, বলিল—"চেষ্টা করিলে কি তদপেক্ষা সৎপাত্র জুটিবে না ?"

"কেন জুটিবে না, জান ত মা, অকালকুষ্মাণ্ড একটি গর্দ্ধভ ঐ হারাধনের ছেলেটা, তারি সঙ্গে এমন মেয়েটার বিবাহ হইবে ?"

"হারাধনের পুত্রটি যে নিরক্ষর মণিবাবু, ঘরে ভাতও নাই, আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন।" বলিয়া কমলা উপরে চলিয়া গেল। মণিবাবুর কন্যা মহামায়া তখন নিজের কুঞ্চিত অলকগুচ্ছের সুবাস ছড়াইয়া

ব্যাকরণ শাস্ত্রের পোকা মারিবার চেষ্টায় পিতার নৃশংস কার্য্যের আলোচনা করিতেছিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"মায়া, বাপ যে সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছেন, তাহাতে তোমার মত আছে ত ?"

মহামায়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মস্তক নত করিয়া কমলাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কি পাইবে মা, বাবা যাহা করিবেন, তাহাই যে মুখ বুজিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"

"উত্তম কথা মায়া, পিতার কথা শুনিয়া চলাইত সন্তানের কর্ত্তব্য, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, বিবাহ না হইলে কি তোমার বড় কষ্ট হইবে ?"

মায়া ম্লান হাসি হাসিল, কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—"বিবাহটা বোধ হয় মেয়েমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, ঐ বন্ধনকে ছিন্ন করিবার বিধিও ত কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া শুনি নাই।"

"বন্ধন যদি গলার ফাসি হইয়া দাঁড়ায়, তবু কি তাহাকে সাধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রের কথা বলিতেছ মায়া, প্রাচীন বিধানকর্ত্তা মনু বলেন—"কামমামরণং তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তু-মত্যপি। ন কদাচিৎ প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।" কন্যা ঋতুমতী হইয়াও মরণ পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে থাকিবে, কোন সময়ের জন্যই গুণহীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবে না।"

মায়া কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলা বলিল—"আমার উদ্দেশ্যও মনুবচনের যাথার্থ্যরক্ষা, সময় যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে

এমন উদার গভীরার্থ শাস্ত্রকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তবে যে পদে পদেই বিপথে যাইতে হইবে।"

মায়া উল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এমন শাস্ত্র আছে, তাহাত জানিতাম না মা, এখন আর আমার কোন সংশয় নাই। অমন বনজন্তুর হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারিব, এ আনন্দে আমি যেন প্রাণ পাইলাম।"

"বিবাহ যদি নাই হয় মায়া ?"

"দোষ কি ?"

"দোষ কি বলিলে চলিবে না, নিজেকে সামলাইয়া জীবন ভোর সংসারপথের রিপুগুলিকে পদদলিত করিয়া চলিতে পারিবে ত ?"

"সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না মা, তোমার শিক্ষা, তোমার আদর্শ, আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া রাখিবে, আর্য্যধর্ম্মের গরিমা আর্য্যশাস্ত্রের দীপ্তি আমাদিগকে গৌরবিত করিবে। কন্যাসন্তান আর পিতামাতার কণ্টক হইব না। উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত কন্যা যেমন শতপুত্র অপেক্ষাও পিতা মাতার আদরের হয়, আমরা অনুপযুক্ত পাত্র ত্যাগ করিয়াও তাঁহাদের ভীতির কারণ নাশ করিয়া সেইরূপই আদরের হইব।"

"আশ্বস্ত হইলাম মায়া, আজ আমার আশা হইল, আমি যদি নাও থাকি, তবু তোমাদের মত জননীগণের সাহায্যে এ আয়োজন ব্যর্থ হইবে না।"

মায়া সন্ধিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি কথা মা ?"

কমলা একটু হাসিল, উত্তর দিল না, মায়া গম্ভীর হইয়া বলিল—"ওঃ বুঝিয়াছি, এতদিনে বুঝি শিব শ্মশান ছাড়িয়া আমার শিবানীর সন্ধানে বাহির হইয়াছেন, তাহাই হউক মা, আমরা তাহাতে তুষ্ট হইব, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভাবিও না, তোমার কাজের ভার আমাকে দিয়া যাইও।"

কমলা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শিক্ষা সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কি মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে ?"

"সেত তেমন কিছু নহে, অশিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতাকে উপদেশ ও শিক্ষাদানে যে ধৈর্য্যটুকুর প্রয়োজন, তাহা এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিত মহাশয়দের নাই, কাজেই বাদপ্রতিবাদ হইতেছিল, দুদিন হইল পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, মেয়েরাও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়াছে।"

"তোমার ওপরই আমার এই কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে মায়া, খুব সাবধান হইয়া থাকিবে, যখন যেমন হয় আমাকে সংবাদ দিও।" বলিয়া কমলা বাহির হইয়া গেল।

পথে যোগেশকে দেখিয়া কমলা গাড়ী দাঁড় করাইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নিতাই বোসের কোন সংবাদ পাইলেন কি ?"

"এই ত আমি মেডিকাল কলেজ হইতে আসিলাম, শব পরীক্ষা

শেষ হইয়াছে, অভাগিনীকে ডোমের হাতে না দিয়া নিজেরাই দাহ করিতে পারি কি না সে চেষ্টায়ই বাহির হইয়াছি।"

"এর জন্যে আবার চেষ্টা কেন করিতে হইবে যোগেশবাবু।"

"দেশে আচার বা ধর্ম্ম যত থাক না থাক, তাহারই নাম করিয়া অনুষ্ঠান বা বুজরুকিরত অভাব নাই, আত্মহত্যার শবদাহ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সমাজে ঘোট হইবে।"

"কিরূপ চেষ্টা করিবেন, স্থির করিয়াছেন?"

"দেখি বন্ধুবান্ধবের দল হইতে ছিনাইয়া যদি দুচারি জন বাহির করিতে পারি।" "আপনিই যথার্থ দেশের বন্ধু।" বলিয়া কমলা থামিল, যোগেশ ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমনা হইল, কমলা বলিল—"দেখুন, লোক সংগ্রহ হয় ভাল, নয়ত আমাকে সংবাদ দিবেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রী লইয়া আমিই অভাগিনীর দাহের ব্যবস্থা করিব, নিতাইবাবু সম্বন্ধে পুলিস কি বলিতেছে?"

"করোনারের রিপোর্ট না পাইলে কোন কথাই স্থির হইবে না, আগামী সোমবারে বিচার হইবে।" বলিয়া যোগেশ গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। যতক্ষণ দৃষ্টি যায়, কমলা এই আশ্রয়হীন আত্মীয়হীন যুবকটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মনে মনে বলিল—"ভাই ছিল না বলিয়া যে কষ্ট, তাহা আজ পূরণ হইল, ভগবান্ যেন আপনাকে তৃপ্ত করেন, অসম্ভব লোভে যেন আপনার ন্যায় মহাত্মা কর্ত্তব্যচ্যুত না হয়েন।" বলিয়া সেও গাড়ীতে উঠিল।

[৩৪]

কর্ত্তব্যের জন্য কঠোর হইয়াও রমেশ মন ঠিক করিতে পারিতে-ছিল না, তাহার কেবলি মনে হইত,সরযূকে ত্যাগ করিয়া কমলাকে বিবাহ করিলে কমলার প্রতি কর্ত্তব্য রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অথচ সরযূ তাহার স্পর্শেরও অযোগ্য ; যে ভাবে যেমন করিয়া হউক, তাহার ধর্ম্মপথের কণ্টক তুলিয়া ফেলিতে হইবে। আঘাতে অবজ্ঞায় কর্ত্তব্যের টানে একবার রমেশ মনে করিয়াছে, কমলাকে বিবাহ করিয়া আপন আত্মাকে উদ্ধার করিবে, তখনি ভাল-বাসায়, প্রেমে সরযূ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রমেশ তখন কর্ত্তব্য ভুলিয়া ধর্ম্ম ভুলিয়া নিন্দার কথা মনেও না আনিয়া সরযূব জন্য পাগল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সরযূ নিকটে ঘেসিতে দেয় নাই। সহসা সমস্ত ঘটনা বিপরীত হইয়া পড়িল, কমলার যত্ন ও আদর রমেশের মনকে অনেকটা অধিকার করিয়া বসিল, সরযূর চাঞ্চল্যে সূক্ষ্ম মৃত কর্ত্তব্য বুদ্ধি সজাগ হইয়া তাহাকে খোচা দিতে লাগিল, রমেশ ভাবিল, সরযূর ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই হইবে, এ অবস্থায় আত্মাকে দূরে না লইয়া গেলে চলে না, কাজেই সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কমলার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল। কমলার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য, উচ্চ উদারতা প্রভৃতিও ক্রমশঃ রমেশকে টানিয়া আনিতে-ছিল, ইহার উপর আবার যোগেশের সহিত কমলার এই ঘনিষ্ঠতায় একটা আকুল বাসনা যেন তাহাকে কমলার জন্য উতলা করিয়া

তুলিল, রমেশ ঠিক করিল, যে ত্যাগের জন্য সে সরযূর বিবাহের সময় প্রস্তুত হইয়াছিল, এইবার তাহার শেষ, এখন যদি সে আত্মাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে আর সরযূর আত্মরক্ষার উপায় থাকিবে না, অথচ কমলা অসম্মত, যোগেশকে লইয়াই তাহার যত কাজ, রমেশকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করে না। তাই সেদিন সে কঠিন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কমলা বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই একটুও ইতস্তত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নিতাই বোসের কন্যার সংকারের কি পরামর্শ হইল কমলা ?"

"সে যোগেশবাবু জানেন।" বলিয়া উদাস ভাবে কমলা একবার দৃষ্টি পর্য্যন্ত না করিয়া চলিতে লাগিল।

রমেশ একবার কি চিন্তা করিল, নিজে খাট হইতেছে জানিয়াও বলিল—"আবশ্যক হয় ত আমিও সাহায্য করিতে পারি।"

"আপাততঃ তেমন কোন আবশ্যকত দেখিতেছি না।" বলিয়া কমলা চলিয়া গেল। রমেশ বিস্মিত বিবর্ণ মুখে ভাবিতে লাগিল, কমলার একি পরিবর্ত্তন, ইচ্ছা করিয়াই যেন আঘাত করে. অথচ স্নানে আহারে পোষাকে পরিচ্ছদে কতই যত্ন, এ সকল কি কৃত্রিমতা। রমেশ আপনার দুর্ব্বলতা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিল, ভাবিল, যাহাই হউক, কমলাকে আমার চাই, নহিলে সরযূকে বাঁচাইতে পারিব না, এমন সুন্দর জিনিষটাকে মলিন করিতে পারি না, এতে যাহাই হউক, হঠাৎ তাহার অন্য চিন্তা

আসিল, নয়ত দেশ ছাড়িয়াই চলিয়া যাই। মন বুঝিল না, কমলার পিতার কথা তাহার মনে পড়িল। মুমূর্ষুর শেষ অনুরোধ, সরযূর আশাই যদি ছাড়িতে হইল, তবে আর সে অনুরোধ অবহেলা করিয়া পাপভার বৃদ্ধি করিব কেন? নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সে যোগেশের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

কমলা গৃহে প্রবেশ করিতেই ইন্দুমাধববাবু বলিলেন—"দেখ মা, আমার কথাই যদি না রাখিবে, আমিও আর তোমার কথা রাখিব না, এবার হইতে মায়ে পোয়ে বিবাদ হইবে।"

কমলা হাসিল, বলিল—"এবার আপনার আশীর্ব্বাদেরই পরীক্ষা হইবে, দেখি কথা রাখিতে পারি কি না?"

ইন্দুমাধব এ হেয়ালীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তিনি মনে মনে ভাবিতেন, এই যে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহারই জন্য কমলা দিন দিন বিগ্‌ড়াইয়া যাইতেছে, নিজের বুদ্ধির প্রতি ধিক্কার জন্মিল, কেন তিনি এতে আনুকূল্য করিলেন, উৎসাহ দেখাইলেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল বসাইয়াছেন। কমলা বলিল—"আপনি সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া লউন, আমি চা করিয়া আনিতেছি।"

ইন্দুমাধব বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"না মা, আমি আর চা খাইব না, তোমাদের এ সব জেদ আমায় আহারনিদ্রা বর্জ্জিত করিয়াছে।"

কমলা গম্ভীর হইয়া খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল—"আমার অপরাধ বাড়াইবেন না বাবা, খেয়ালে পড়িয়া আমি—"

ইন্দুমাধব কথাটা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন—"ও সব কথা আমি শুনিতে চাহি না। খেয়ালই বল, কাজের কথাই বল, বিবাহ করিবেই না, এমন মতও ত তোমার নয়।"

"ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ সম্ভাবনা হইলে, উচিত স্থানে উপযুক্ত পাত্র পাইলে বিবাহ না হওয়াই পাপের হইবে।"

"তবে ?"

"পিতার স্মৃতি যে আমি পুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না।" বলিয়া কমলা দুঃখে ক্ষোভে মাথা নীচু করিল। ইন্দুমাধব কথাটা না বুঝিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিলেন। কমলা বেদনার ভার হাল্কা করিয়া লইয়া বলিল—"বলিয়া আপনাকে কষ্ট দিব না ভাবিয়াই এতকাল ধরিয়া কথাটা চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। রমেশবাবুর অযথা আক্রমণই যে আমার পিতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।"

ইন্দুমাধব অতিকষ্টে আপনাকে স্থির করিলেন, শূলবেদনার মত এ দারুণ সংবাদটা তাঁহার বুকের উপর বড় জোরে আঘাত করিতেছিল, অতি কষ্টে মনের বেগটা চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন—"ও কথা তুমি মনেও স্থান দিওনা মা, রমেশের কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে তাহা যে তোমার পিতাই ক্ষমা করিয়াছেন, তুমি কেন পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে!"

কমলার শরীর ঝাকানী দিয়া কাঁপিয়া উঠিল, একটা কাল পর্দ্দা চোখের উপর হইতে সরিয়া গেল, ইন্দুমাধবের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"আপনিও আমার পিতৃস্থানীয়, আপনার আজ্ঞাপালন করিতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব, আমাকে প্রস্তুত হইতে দিন।"

[৩৫]

সরযূ তাহার মনকে বিপথে ছাড়িয়া দিল, মাতা চলিয়া গেলে কন্যা মনে মনে বলিল—"আমার এখানে কোন অনুতাপ নাই, মা মনে করিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার সমাজ আমাকে শিকারের জন্তুর মত তাড়া করিয়া অতল সমুদ্রের ধার পর্য্যন্ত নিয়া ঠেকাইবেন, তাঁহাদের মতেই আমাকে বাঁধা পড়িতে হইবে, তিনিত জানেন না, সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িতে আমার যে ভয় ছিল, তাহা তাঁহার এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই কাটাইয়া দিয়াছে। চেষ্টার আমি ত্রুটি করি নাই, হয়ত কৃতকার্য্যও হইতাম, এখন কিন্তু তাঁহার শীকারী কুকুরের থাবার মধ্যে প্রবেশ করিতেই আমার যত ভয়।"

রমেশের মন যে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে, সরযূ সে কথা ভাবিয়া নিরুপায় হইয়া পড়িল, "কি ভুলই করিয়াছি, ইচ্ছার গতিকে রোধ করিতে গিয়া, সেখানেও পরাস্ত হইলাম, সাধা জিনিষও পায়ে ঠেলিয়া

দিলাম, একূল ওকূল দুকূল হারাইতে হইল। কিন্তু আমায়ত নিরাশ হইলে হইবে না, বুক যে পুড়িয়া যাইতেছে, যেমন করিয়া হউক, বাসনা তৃপ্ত করিব, বুকের জ্বালা জুড়াইব, রমেশকে আমার চাই।"

যে কারণেই হউক, সরযূ রমেশকে ভুল বুঝিয়াছিল, হয়ত রমেশের দুর্ব্বলতাই তাহাকে বিপরীত বোঝাইয়াছিল। রমেশের মনের কোণে সত্যকার যে মাহাত্ম্যটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল, সরযূ আঘাত করিয়া তাহার আবরণ দূর করিয়া দিয়াছে, উপেক্ষার মুখে রমেশ যে মাহাত্ম্যটুকুর অনুভূতিও দেখিতে পায় নাই, খেয়ালে বাধ্য হইয়া তাহার নিরাশ নিদ্রিত হৃদয় কর্ত্তব্যের পথ ভুলিয়া সরযূর জন্য আশ্বাসবর্জ্জিত একটা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া মনের লাগাম ছাড়িয়া দিয়া সরযূকে যা তা বলিত, সরযূ যতই কঠিন হইতেছিল, রমেশ ততই আলগা দিতেছিল, তারপর সরযূর কাঠিন্য কাটিয়া গেল, রমেশের কর্ত্তব্য সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তেই সে মনে করিল, এবার কঠিন না হইলে আর সরযূর ধর্ম্মরক্ষা হইবে না, প্রলোভনের মুখে অস্থিরতাকে দাঁড় করিয়া যদি দুই দুইটি মানুষই তৃষিত বাসনা পূরণ করিতে যায়, তবে কর্ত্তব্য ভাসিয়া যাইবে, স্নেহ বা ভালবাসার মধ্যে কৃত্রিমতা আসিবে, হৃদয়কে বাসনারই দাস করা হইবে, নিজের মনুষ্যত্ব ত যাইবেই, যাহাকে প্রাণাধিক পৃথিবীর সার বস্তু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি, তাহাকেও কলঙ্কিত করিতে হইবে। কাজেই মুখের গোড়ায়

উপস্থিত জলের গ্লাসটা বিষমিশ্রিত মনে করিয়া রমেশ পিছাইয়া নিজের স্থান খুজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, যেখানে তাহার দ্বিধা, যেখানে তাহার কুণ্ঠা, সে দোরটা একেবারে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিল। এপথ যে স্খলনের দিকে লইয়া যাইবে, তাহা বুঝিয়াই বুক বাঁধিয়া জোর করিয়া সরযূকে আঘাত করিয়া চলিল, সরযূ এতটা বুঝিল না, নানা চিন্তায় গভীর রাত্রিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্নময় নিদ্রার ঘোরে তাহার আলস্যলাস্যলুলিত মন টলিতেছিল, বলিতে-ছিল,—"তাঁহাকে আমার চাই, আমি যে তাঁহারই চরণে দেহ মন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি।"

রমেশ তখন অনেক দূরে, সরযূ যে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিয়াছে। রমেশ যখন ব্যাকুল ছিল, তখন হয়ত ইচ্ছামাত্রেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইত, আরত তাহা হইবার যো নাই, কে যেন সরযূর কাণে এই নিরাশ-ব্যথিত সংবাদটি বহন করিয়া আনিল, সরযূ চমকিয়া উঠিয়া চোখ চাহিতেই দেখিল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, ভোরের দিকে তাহার মনটা আরও বিকল হইয়া পড়িল, সুশীলা আসিয়া ডাকিলেন—"সরযূ ওঠত মা, আজ একটু খাটিতে হইবে, আমার যে ব্রত।"

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল, মাতার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই দৃষ্টি নামাইয়া লইল, উত্তর করিবার প্রবৃত্তি ছিল না, যেন শক্তিও ছিল না, সুশীলা বলিলেন—"নটার মধ্যে পূজা শেষ করিতে হইবে, তুমি

মা স্নান করিয়া তাহারই আয়োজন করিয়া দাও, আমি এদিকে দেখিব।"

এবার আর সরযূ পারিল না, রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"আমাদ্বারা কোন্ কাজ হইবে মা, আমি যে অশূচি।"

সুশীলা কথাটা বুঝিলেন না, সরযূ একেবারে জ্বলন্ত লৌহের মত তীব্র হইয়া বলিল—"আমার মন যে অশূচি তাহা জানিয়াইত আমায় তুমি সন্দেহ করিয়া আসিতেছ, তবে আর কেন, আমিও আজ তোমায় স্পষ্টই বলিতেছি, আমাদ্বারা এ সকল কাজ আর করাইতে যাইও না।"

কোথায় সরযূর মাতৃস্নেহ, কোথায় মাতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগের দৃঢ়সঙ্কল্প, সুশীলা শিহরিয়া উঠিলেন, সরযূর হাত ধরিয়া বলিলেন—"ছিঃ মা, হিন্দুর মেয়ে হইয়া নাকি এমন কথা মুখে আনিতে আছে।"

সরযূ বাধা দিল, বলিল—"মনে যাহা থাকিবে, তাহা মুখে আনিলেই দোষ হইবে, এমন দোষ মানি না বলিয়াই তোমাদের সহিত আমার বনিল না—" বলিয়াই অর্দ্ধপথে সে থমকিয়া গেল, কথাটা যে, মাত্রা ছাড়াইয়া কতদূর উঠিয়াছে, তাহা কে যেন মুখ আটকাইয়া ধরিয়া তাহাকে জানাইয়া দিতেছিল।

সুশীলার মুখ লজ্জায় ও চিন্তায় কাল হইয়া গেল, অস্পষ্টভাবে শব্দ হইল,—"ভগবান্, অভাগিনীকে ক্ষমা কর, তোমার দয়া ছাড়াত আর পথ নাই।"

[৩৬

যোগেশের সন্ধানে বাহির হইয়া রমেশ আসিয়া তাহাকে নিমতলার শ্মশানঘাটে ধরিল, নিতাইবোসের কন্যার দাহ তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, কমলা তাহার সমভিব্যাহারিণী ছাত্রীগণে বেষ্টিত হইয়া চিতাধূমের দিকে তাকাইয়াছিল, নিতাইবোস একটু দূরে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন, আর যোগেশ এই দাহকার্য্যের কর্ণধাররূপে সমস্ত নির্ব্বাহ করিতে আশেপাশে ঘুরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। রমেশ যোগেশের কাজের সহায়তার জন্য তাহার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেই যোগেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ওকি কর রমেশদা, ছুঁইয়া ফেলিও না যেন, জানত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

রমেশ দুই পা সরিয়া দাঁড়াইল, উচিত প্রায়শ্চিত্তে তাহার দ্বিধা ছিল না, কিন্তু কমলার কথাটা তখনও মনে জাগিতেছিল, যেন যোগেশই সব। কমলা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে যোগেশকে সম্বোধন করিয়া বলিল– "যোগেশবাবু, আজ আমাদের এই দুঃখের মধ্যে যে আশাটুকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না, নিতাইবাবুর মত কন্যার পিতারা হয়ত এ আদর্শে শিখিবেন যে, কন্যা বিবাহ না দিয়া ঘরে রাখিয়া যে ক্লেশ, তাহার আত্মহত্যায় তদপেক্ষা কম ক্লেশ নহে।"

নিতাই বোস অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল —"মা যদি আমার বাঁচিয়া থাকিত, তবে ত সমাজের পীড়নকে আমি দুঃখ বলিয়াই মনে করিতাম না।"

"পীড়ন কেন মনে কবিতেছেন, কে কার পীড়ন করিতে পারে নিতাইবাবু; কর্ত্তব্যে যে পীড়ন, সেত শান্তিই আনয়ন করে।" বলিয়া কমলা জলদগম্ভীর স্বরে বলিল—"এজন্য আপনি দুঃখও করিবেন না, এত আপনার কন্যার প্রকৃত মৃত্যু নহে, এযে দৃষ্টান্ত, ভাগ্যবতী অভাগিনীদের ভার লাঘব করিবার জন্যই অকালে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল, এই চিতাগ্নিতে এ দেশের দেহ শুদ্ধ হইবে, মন পবিত্র হইবে, আত্মায় বল আনিয়া দিবে, সমাজের নির্য্যাতন কমিবে। অন্ততঃ একবার চিন্তা করিতে সমাজ কুণ্ঠিত হইবে না যে, পীড়নের পরিণাম এইরূপ, নৃশংসতা কমিয়া আসিবে, স্ত্রীহত্যা হইতে দেশ উদ্ধার হইবে।" বলিয়া কমলা থামিল, যোগেশকে ডাকিয়া গোপনে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিয়া আবার উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"আপনার ন্যায় মহাত্মার আশ্রয়ে আমার এই কার্য্য সুফল প্রদান করিবে যোগেশবাবু, আমার অনুরোধ এই স্ত্রীহত্যার জলন্ত দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া আপনি এ কার্য্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।"

রমেশ দূরে দাঁড়াইয়া জ্বলিতেছিল, যোগেশ আর কমলায় কত ঘনিষ্ঠতা, যেন যোগেশের মত বন্ধু আর তাহার নাই।

কমলা আবার বলিল—"যোগেশবাবু, এই মায়া আমাদের প্রধান অবলম্বন, উপযুক্ত পাত্র পাইলে ইহারও বিবাহ হইয়া যাইবে, আপনি প্রস্তুত হউন, যাহাতে শীঘ্র এমনই আরও দুই চারিটি মেয়েকে শিক্ষিতা করিয়া লইতে পারেন।"

মহামায়া কমলার দিকে চাহিল, কমলা তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল—"কি ভাবিতেছ মায়া, বিবাহ করিবে না, অমন ভাবনা মনেও আনিতে নাই, পিতা যদি যোগ্যপাত্রে অর্পণ করিতে চান, হাসি মুখে বন্ধন স্বীকার করিবে। ঐ বন্ধন যে স্ত্রী হৃদয়ের সার রত্ন, আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে ভুল করিও না মায়া, অপাত্রে আত্ম সমর্পণ অথবা অসমর্থ পিতার ভার-বর্দ্ধন-জনিত তীব্র দুঃখের লাঘব করাই আমার এই কার্য্যের প্রধান ও প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

নিতাইবাবু কাঁদিয়া উঠিলেন—"কি ভুলই আমি করিয়াছি, পীড়নকে যদি পীড়ন বলিয়া মনে না করিতাম, অশান্তি বহন করিতেছি বলিয়া কন্যার মনে ক্ষোভ না জন্মাইতাম, তবে ত মা আমায় ছাড়িয়া যাইত না। অযথা বন্ধুত্ব করিয়া যাহারা নির্য্যাতন করিতে আসে, তাহাদের আসিতে না দিয়া তাড়াইয়া দিলেই আমার কি ক্ষতি হইত, আমি অভাগা, অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া বৃথা ভার ভাবিয়া কন্যার মৃত্যু কামনা করিয়া পাপী হইয়াছি। মা ত আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিল না।"

"বোঝ মায়া" বলিয়া কমলা জোর দিয়া বলিতে লাগিল—

কি নৃশংসতা, পিতামাতাও সন্তানের মৃত্যুকামনা করে, ভীরু কাপুরুষগুলো তবু সমাজের ভয়কে হেলা করিতে শিখিল না। তুমি ঠিক জানিবে মায়া, আত্মহত্যা যাহারা করে, তাহারা সামান্য কষ্টে করে না। প্রাণত্যাগ অতিকষ্টেরই পরিণাম।" বলিয়া কমলা থামিল, তাহার চোখ বাহিয়া এই ভস্মীভূত দেহটীর উদ্দেশে সার্থকতার একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। যোগেশ ডাকিয়া বলিল—"দাহ শেষ হইয়াছে, এবার চলুন, চিতা ধৌত করিয়া স্নান করিতে যাই।"

রমেশ এত সময় অপরাধীর মত দাঁড়াইয়াছিল, এখানে যেন তাহার প্রবেশের অধিকারও নাই, একটা শূন্য শ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেহ ডাকিল না, একবার জিজ্ঞাসাও করিল না, উপেক্ষাই তাহার পাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া স্থির করিয়া লইল।

[৩৭]

বাড়ীতে ঢুকিতেই রমেশ দেখিল, রতন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সহসা সেদিনের সেই কথাটা তাহার মনে পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল —"কি রে রতন, এমন অসময়ে যে ?"

রতন একখানা চিঠী হাতে দিয়া নিরুত্তর রহিল, রমেশ দেখিল দুটিমাত্র কথা—"এখনি আসিবে সরযূ।"

রমেশের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, সরযূর এই আহ্বানে আনন্দের সঙ্গে যেন একটা ভয় জড়িত ছিল। সরযূ তাহাকে যেদিকে টানিতেছিল, এবং আশৈশব তাহার জীবন আপনার শীকড় ও সমস্ত ডালপালা লইয়া যে দিকে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই স্মৃতি যে পদে পদে রমেশকে অস্থির করিয়া তুলিবে। শীকারী জন্তুর মত রমেশের মনে কোন দিনই ত্যাগের আভাস ছিল না, তাহার চিরকোমল হৃদয় বিরুদ্ধ তর্ক করিতে হইলেই অসামাল হইয়া পড়িত, তাই সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল —"রতন, আমার না গেলেই কি নয় রে?"

রতন বলিল—"সে কথা আমি কি করিয়া বলিব, সরযূ দিদি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন।"

না গিয়া থাকাও রমেশের কেমন শক্ত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিতে লাগিল—"তোমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা কহিব না সরযূ, ডাকিয়া যখন পাঠাইয়াছ, তখন যাইব, ভুল করিয়া আর পথ হারাইও না, ইহাই তোমাকে বলিয়া আসিব। তুমি যাঁকে আরাধ্য বলিয়া জানিয়াছ, সে তোমার আরাধ্য নহে।"

রাত্রি নয়টা বাজিতে রমেশ আসিয়া হাজির হইল। সুশীলার আহ্নিক তখনও শেষ হয় নাই। রমেশ বরাবর উপরে চলিয়া গেল, দেখিল ঘর শূন্য, পাশের ঘরে সোণামণি বসিয়াছিল, বলিল— "দিদি ছাদে আছেন।"

রমেশ ছাদে উঠিয়া গেল, সাদা কাপড় পড়িয়া সরযূ যেন শ্বেত জ্যোৎস্নার কোলে লুকাইয়া রহিয়াছে। পাশের বাড়ীর বাগান হইতে বেলা ও যূঁই ফুলের গন্ধ ছুটিয়া আসিতেছে, সোণামণি আসা অবধি শুষ্ক টবগুলিতে জল পড়িতেছিল, সিক্ত মাটির গন্ধ লইয়া শান্ত শরতের বায়ু মৃদু মন্দ বহিতেছে। রমেশের মন উদাস হইয়া উঠিল, ডাকিল—"সরযূ?"

সরযূ সাড়া দিল না, একলক্ষ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া মৃত্ শ্বাস ত্যাগ করিল।

রমেশ আবার ডাকিল, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছ সরযূ?"

সরযূ ঝড়ের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"ডাকিয়া না পাঠাইলে কি তুমি আসিতে, এপথ যে ভুলিয়া গিয়াছ!"

রমেশ আত্মসংযম করিল, সরযূর কথায় প্রতিবাদমাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সরযূ কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"হাঁ আমি ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।" একবার থামিল, একমুহূর্ত্ত নীরবে ভাবিয়া লইয়া বলিল—"সংগ্রামের মধ্যে আমি আর আমার ক্ষতবিক্ষত দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, তাই সে সংগ্রামের শেষ করিয়া শান্তির জন্য তোমার কাছে ছুটিয়া চলিয়াছি।"

রমেশ স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কি করিব সরযূ?"

"নূতন কিছুই নহে।" বলিয়া সরযূ ঢোক গিলিল, মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"চিরদিন যাহা জানিয়া আসিয়াছি, যাহা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি, আজও আমার সেই প্রার্থনা। জীবনে কোনদিন তোমাকে ছাড়া ভাবি নাই, একদিনের জন্য ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মাত্র, সে ভাবনা যখন ভগবান্ উঠাইয়া লইয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছি, তিনি আমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, চিরজীবন যদি দুঃখ দিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে এ বিধান তাঁহার বিধিসঙ্গত হইত না।"

সরযূ একপা অগ্রসর হইল, রমেশ সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু জবাব করিল না, সরযূ আবার বলিল—"আমি আর পারি না, ধর্ম্মতঃ আমি তোমারই, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না, আমায় গ্রহণ কর, আমাদের প্রেম, আমাদের সম্মিলিত জীবন একটা ঢেউ তুলিয়া দিক, সমাজের ধূলিকাদা ঝাড়িয়া আমরা নূতন পথে সকলের বড় হইয়া দাঁড়াইব।"

রমেশ আজ পাষাণ-কঠোর, তাহার নির্ম্মম মনের কোণে একবিন্দুও করুণা ছিল না, উপেক্ষার বোঝা বুকে করিয়াই যেন সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ধীরকণ্ঠেই বলিল,—"ভুল করিতেছ সরযূ, ভগবানের অভিপ্রায় তুমি নাও বুঝিতে পার, তিনি যে তোমায় বিপথের পথিক করিবার জন্যই এমন ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, এমন কথা ভাবিও না। বিধবার কি কোন কাজ নাই

যে, এই দূরকাঙ্ক্ষা পোষণের জন্যই তিনি তোমাকে বৈধব্যের ভার দিয়া সংসারে রাখিয়াছেন।"

সরযূ অস্থির হইয়া কঠোর কণ্ঠে বলিল,—"অত আমি বুঝি না, সে শক্তিও আমার নাই, সাহসও নাই। আমি জানি, আমি তোমার, তুমি আমার, এই চিরন্তন সত্য লঙ্ঘন করিও না। বল, তুমি আমায় গ্রহণ করিবে?"

রমেশ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল—"না, সে অধিকার আমার নাই।"

সরযূ রমেশের হাত ধরিতে গেল, সহসা তাহার চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল, উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল—"নিষ্ঠুর, সে অধিকার তোমার নাই, তবে কেন এ বালিকার জীবন এমন কণ্টকময় করিয়াছিলে, আমার জীবন লইয়া তোমার কি সুখ, যদি সে জীবন ভোগে না লাগাইলে?"

রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"কি বলিতেছ, সরযূ, একদিন তুমি আমায় ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলে, আমি সেই দাবীতে বলিতেছি, ধর্ম্ম খোয়াইও না, যদি সুখী হও, তাঁহার আশ্রয়েই হইতে পারিবে—"

সরযূ জোর করিয়া রমেশের হাত ধরিল, বলিল—"আমি সে সুখ চাইনা, আমি জানি তুমি আমার, বল আমাকে গ্রহণ করিবে কি না?"

রমেশ হাত ছিনাইয়া লইল, স্থিরস্বরে উত্তর করিল—"অসম্ভব, তোমাকে আমি দেবী দেখিতে চাই, পবিত্র প্রণয়কে দূষিত হইতে দিব না। ভ্রাতা ভগিনীকে রক্ষা করিবে, তোমার ধর্ম্মনাশ করিবার অধিকার ত আমার নাই।"

সহসা সরযূ হাটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল, রমেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া বলিল—"আমায় পায়ে রাখ, বিধবা বিবাহত অশাস্ত্রীয় নয়, তুমি আমায় বিবাহ কর, আমার বুকের জ্বালা জুড়াইতে দাও।"

রমেশ সস্নেহে সরযূর হাত ধরিয়া তুলিল, সরযূ সে স্পর্শে কাঁপিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল-- "কত দিন পরে?"

রমেশ কথাটা কাণে তুলিল না, যেন শুনিতে পায় নাই; এমন ভাবে বলিল—"তুমি আমার বোন সরযূ, মাকে দেখিয়াও শিখিতে পার না, যাও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনি তোমায় প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবেন।" বলিয়া সে আর মুহূর্ত্ত মাত্র গৌণ না করিয়া ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

মুমূর্ষুর মত অপমানিতা অবজ্ঞাতা সরযূ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ছাদের উপর লোটাইতেছিল, সুশীলা আসিয়া হাত ধরিলেন, বলিলেন -"আয় মা, আমি তোকে বুকে করিয়া রাখি, আমার এ বুক তোকে যে শান্তি দিতে পারিবে, শত রমেশ তাহা পারিবে না।" বলিয়া কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

[৩৮]

যোগেশের মধ্যে এমনই একটি উদ্দীপ্ত মাহাত্ম্য ছিল, যাহা তাহাকে দুর্ব্বলতার হাত হইতে টানিয়া আনিয়া এই সর্ব্বমঙ্গলময় কার্য্যের সারবত্তা বুঝাইয়া দিল। একদিন এক মুহূর্ত্ত কমলার প্রতি যে বিষদৃশ দৃষ্টিতে সে তাকাইয়াছিল, তাহার জন্য আত্মাকে অপরাধী মনে করিয়া কমলার অভিপ্রেত কার্য্যের মধ্য দিয়া সে আত্মদোষ ক্ষালনে সচেষ্ট হইল, বিশেষ করিয়া কমলার কর্ত্তব্য জ্ঞান, কার্য্যতৎপরতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া যোগেশ তাহাকে অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী বলিয়া স্থির করিয়া লইল, তাই সে বন্ধন কাটাইল, জালে পড়িয়াও স্বশক্তিতে তাহা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, কমলাকে জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়া কার্য্যের সফলতার জন্য নিজেকে অনন্যকর্ম্মা করিয়া তুলিল।

সেদিন করোনারের বিচারের শেষ সংবাদ জানিয়া নিতাই বোসকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখিল, কমলা উদ্গ্রীব ভাবে তাহার অপেক্ষা করিতেছে। অন্য কোন কথাই না উঠাইয়া বলিল—"আর কোন গোলযোগ হয় নাই, ইন্দুমাধববাবুর সহিত সেখানকার অনেকেরই বিশেষ পরিচয় ছিল, তিনি বলিতেই এটা যে ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া নিতাইবাবুকে মুক্তি দিয়াছে।"

কমলা আশ্বস্ত হইল, যোগেশ বলিল—"এই বিবাহ ব্যাপার

লইয়া দেশে যে সব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার জন্ত দেখিলাম সকলেই চিন্তাকুল।"

"চিন্তাকুল হইলেত কাজ হয় না যোগেশবাবু, উপায়ের জন্য কি কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে।" বলিয়া কমলা সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

যোগেশ কহিল—"চেষ্টারই বা ত্রুটি কি হইতেছে, বরপণ প্রভৃতি উঠাইয়া দিবার জন্ম সভাসমিতি বিচারবিবেচনার ত অভাব নাই।"

কমলা একটু হাসিল, চিন্তা করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—"যেখানে রোগ সেখানে ত অষুধ প্রয়োগ হইতেছে না যোগেশবাবু? সাধারণের বুদ্ধির ও'পর কথা বলি এমন শক্তি বা সাহস আমার নাই, তবু যেন স্বতঃই মনে হয়, বরপণের প্রতিকারের চেষ্টায় বিশেষ কোন উপকার পাইবার আশাই নাই। তাহার মানে, আমাদের এ দেশে ছেলেদের মধ্যে তিন তিনটি দল হইয়াছে, একটি বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আরেক দল বলেন, বেশী বয়সে উপযুক্ত হইয়া বিবাহ করিব, তৃতীয় দলের আরও উৎকৃষ্ট পথ, ডানা কাটা পৈরি না হইলে বিবাহ হইবে না। মেয়েদের পক্ষেত ইহার কোনটিই খাটে না, কাযেই এত বড় শক্তিশালী তিন তিনটা দফার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে স্বধু অর্থেই স্বার্থকতা হইবে না, যে পরিমাণে পুরুষ অবিবাহিত থাকিবে, সে

পরিমাণে বা তাহারও বেশী পরিমাণে মেয়েদেরও বিবাহ না দিয়া রাখিতে হইবে, বয়স্থা করিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। বাছাবাছির ভারটাও যেখানে পিতামাতা না লইবেন, সেখানে কন্যার ও'পর অর্পিত হইবে। অর্থাৎ আঘাতের উপর আঘাত দিয়া যদি পার ত এই দেশের দুর্দ্দিনান্ধকার কাটাইয়া উঠিতে হইবে, নৈলে স্ত্রীহত্যার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে, কমিবে ত না।"

যোগেশ এক মনে কমলার কথাগুলিই শুনিতেছিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল, আপাতত ইহার ভালমন্দ বিবেচনা ভুলিতে হইবে, কারণ, কার্য্যের আরম্ভেই সূক্ষ্মবিচার করিতে গেলে সে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, বরং পিছাইয়া পড়িতে হয়, আরও ভাবিল যে, সমাজে যদি এই নূতন জিনিষটা প্রবেশ করাইতে হয়, তবে আমাদিগকে অনেক বড় হইতে হইবে, যখন যে কোন ব্যক্তি নূতনত্ব লইয়া সমাজের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তাহাকে নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইয়া আঘাত প্রত্যাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। আমাদের এই সম্মিলিত চেষ্টা যেন প্রলয় শক্তির সূচনা না করিয়া সৃষ্টি ও স্থিতির তত্ত্বানুসন্ধি হয়। এ কাজ-টাকে মানুষমাত্রেই দুঃসাহসিকতা বলিয়া মনে করিবে, ইহার মধ্যে এমনই একটা বীরত্ব রক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে আমাদিগকে নামিয়া পড়িতে না হয়। এই অবস্থায় সমাজ আমাদিগকে সাধারণের

সমান ক্ষেত্রে বহন করিয়া লইবে না, হয় নিজের শক্তিতে বড় হইতে হইবে, নহিলে ছোট হওয়া অনিবার্য্য, ভবিষ্যৎ শুভাশুভের জন্য সিদ্ধির নিশ্চয়তার জন্য শক্ত থাকিতে যোগেশ তন্ময় হইয়া উঠিল, নিজের জীবনদ্বারা এই নূতন সমস্যার মীমাংসা করিয়া সমাজকে বড় করিতেই হইবে, বিধি মানিয়া সমাজকে বহন করা আজ আর যোগেশের কাছে উৎকর্ষজনক বলিয়া জ্ঞান হইল না। ধ্যানভঙ্গ মৌনী মুনির সতেজ উক্তির ন্যায় যোগেশ বলিয়া উঠিল—"আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, আমারও বিশ্বাস ইহারই এখন প্রয়োজন, আমি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, ভগবান্ আপনার সহায় হউন, তিনি কোন এক ব্যবস্থার মধ্যে তাঁহার সৃষ্টিকে শিকলবদ্ধ করিয়া রাখেন না, তাহাকে নূতন নূতন পরিণতিতে চিরনবীন করিয়া তুলিয়া থাকেন, আমরা তাঁহার সেই উদ্বোধনের প্রতিনিধিরূপে নিজের জীবনকে উজ্জ্বল আলোর মত জ্বালাইয়া দুষ্প্রবেশ্য পথে প্রবেশ করিব, যিনি বিশ্বের পরিচালক, তিনি আমাদিগের পথের কাঁকর কাঁটা মুক্ত করিয়া দিলেন।" বলিতে বলিতে যোগেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কমলার গণ্ড বহিয়া জল পড়িতেছিল, মহামায়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইতেই সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"কাজের কতদূর করিলে মায়া ?"

মায়া একটু হাসিল, বলিল—"মা, তোমার কথাত বিফল হইবার নহে, এ দুদিনে আমি অনেকটা আশা পাইয়াছি।"

"আহা সরযূদিদি বড় অভাগিনী ; তাহার জ্বালা যদি জুড়াইবার পথ করিতে পার মায়া, ভগবান্ তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

"পথ যখন পাইয়াছি, তখন আর ছাড়িব না মা, জানত চোর সিঁধ দিতে পারিলে ঘরে না ঢুকিয়া ছাড়ে না। দুদিনেই বেশ মেলামেশা হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের উদ্দেশ্যও বুঝাইয়া বলিয়াছি, দেখিলাম, বেশ ঔৎসুক্য রহিয়াছে।"

ইন্দুমাধব উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মণিবাবুর সঙ্গে তোমরা কি গোল বাধাইয়াছ মা ?"

কমলা বিনয়নম্রবচনে উত্তর করিল,—"গোল, কৈ না, তেমনত কিছু ঘটে নাই, তবে তাঁহার কন্যা এই মায়া অপাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে না, আমি সে কথাটা বুঝাইয়া বলিয়াছি মাত্র।"

"শুনিলাম, মণিবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি নালিশ করিবেন, তোমরা তাঁহার কন্যাকে ছিনাইয়া আনিয়া মানহানি করিয়াছ।"

মায়া উদ্ধতস্বরে বলিল—"সেজন্যে আপনারা ভয় করিবেন না, আমি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, বলিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যাইবে।"

ইন্দুমাধব মায়ার গায়ে হাত রাখিয়া ধীর কণ্ঠে বলিলেন- "উদ্ধত হইওনা মা, পরিষ্কার করিব বলিয়া যে পূর্ব্ব হইতে জঞ্জাল কুড়াইয়া জড় করিতে হইবে, এমন কথাকে আমল দিতে পারি না, ন্যায়ের জন্যে প্রস্তুত হইতে গিয়া প্রথমেই এত বড় একটা অন্যায় করিও

না, পিতা পরমপূজ্য, পারত পক্ষে তাঁহার সহিত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি কেন ?"

যোগেশ বলিল—"কিছুই করিতে হইবে না, আমি জানি, আমাদের এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বিমুখ হইবেন না, যদি তেমন কিছু ঘটে, সমস্ত খুলিয়া বলিলেই মিটিয়া যাইবে।"

ইন্দুমাধব নীরবে সন্তুষ্টি জানাইলেন, বলিলেন—"আমি আর একটি শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, সুশীলা তোমাদের এ কার্য্যের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন, এবং নিজে যতটা পারেন, করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

কমলা ইন্দুমাধবের পায়ের ধূলা লইল, বলিল—"আপনার আশীর্ব্বাদে এ কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না।"

ইন্দুমাধব বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—"আমাকেত তুমি পিতার মত ভক্তি কর কমলা, আমি তোমার এই কার্য্যের সফলতার জন্য রহিলাম, তুমি কি আমার বাসনা পূর্ণ করিবে না ?"

যোগেশ একবার কালি মুখে কমলার প্রতি দৃষ্টি করিল, সহসা সুশীলা উপস্থিত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তোমার পিতৃবন্ধুর এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবে না, যাহাদের কোন কাজ নাই, তাহারাই একার্য্য করিবে। আমরা রহিয়াছি কি জন্যে। তোমার হাতের ওপর মস্ত সংসার, তোমাকেত আগুতে তাহাই আল্‌গাইতে হইবে।"

কমলা চাহিয়া রহিল, উত্তর করিল না, সুশীলা আবার বলিলেন—"তোমার এই স্বীকারের ও'পর আমার মস্ত একটা সঙ্কট উদ্ধারের উপায় প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি রমেশের ভার লইলে আমরা তাহার জন্যে নিশ্চিন্ত হইব।"

কমলা ছোট্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি পারিব?"

"পারিবে।" বলিয়া ইন্দুমাধব ও সুশীলা ভবিষ্যৎবাণীর মত বলিলেন—"তুমি পারিবে, তোমার যাহা অসাধ্য তাহাত আর কাহারও সাধ্যের হইবে না। পিতার কথা ভাবিয়া যদি দুঃখ পাও, আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এই মিলিত আশীর্ব্বাদ তোমার সেই দুঃখ বিস্মৃত করিয়া দিবে।"

কমলা মাটিতে পড়িয়া সুশীলা ও ইন্দুমাধবের পায়ের ধুলা লইল।

[৩৯]

সরযূর যেন আকস্মিক একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটিল, বিধবা হইয়াই যে জিনিষটা সে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতেছিল, বাধা পাইয়া তাহা দূর হইতে উদ্যত হইতেই সে আবার তাহা চাপিয়া ধরিল। সুশীলার বুকে মুখ লুকাইয়া মাতার কথাটা অতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল, নির্ম্মল, অনাবিল মুক্তস্নেহ মাতৃহৃদয়ে যত আছে, এত আর কোথাও নাই, তাহার উপর আবার রমেশের এই

দৃঢ়তা ধৈর্য্যের গোড়ায় ভর দিয়া সরযূকে আত্মস্থ করিয়া তুলিল, সে মনে মনে বলিল--"অকারণ আমার হৃদয়ের গুরুভার আর বাড়াইতে যাইব না, রমেশকেই কেন ধরিয়া রাখিতে চাই, তাহার জীবন যদি অন্যের আশ্রয়ে সুখী হয়, সে সুখ বিকৃত করিবার অধিকার আমার কি আছে।"

কদিনের যাতায়াতে মহামায়ার সহিতও তাহার মতের একটা ঐক্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সোণামণির সহিত কার্য্যে কথায় আলাপ করিয়া গল্প করিয়া সে যে কি দুঃখটা কেমন করিয়া চাপিয়া রাখিতেছে, ভাবিয়া নিজেও ধৈর্য্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল। নিজের ভার নিজে না রাখিয়া ভগবানের উপর ফেলিয়া রাখিতে পারিলে অনেক শান্তি পাওয়া যায়, অভিভাবকের হাতে সংসারের ভার দিয়া কনিষ্ঠ যেমন নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যায়, কি করিয়া আহার জুটিবে, আয়োজন হইবে, একবার সে চিন্তাও করে না, সরযূও ঠিক সেই ভাবে আপনার ভারি বোঝা ঠেলিয়া ফেলিয়া মনকে শাসনে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সেদিন সোণার স্বামী আসিয়াছিল, সরযূ সোণাকে ডাকিল না, নিমেষহীন লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সোণা এই অত্যাচারী নির্দ্দয় স্বামীটির জন্য কেমন করিয়া প্রাণের সমস্ত বাসনা ঢালিয়া দিয়া আয়োজনে উদ্যোগে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, একটু দ্বিধা নাই, একবিন্দু অভিমান নাই, ঘৃণার পরিবর্ত্তে স্নেহ যেন

তাহার চোখমুখ ছাপাইয়া বাহির হইতেছে, সরযূ স্তম্ভিত হইল, অজ্ঞাতে তাহার মনের কোণে সেই একদিনের পরিচিত স্বামীটিব কথা মনে পড়িল, সুশীলার জ্বালায় সে অনিচ্ছায়ও অনেক ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিল, আজ সেগুলি কাজ দিল, সরযূ মনে মনে বলিল—"সেত মরে নাই, আত্মত্যাগ করিয়া পরলোক হইতে আমার জন্য উন্মুখ অপেক্ষায় চাহিয় রহিয়াছে।"

সুশীলা আসিয়া বলিলেন - "সরযূ, আমি মনে করিয়াছি, এবার হইতে মহামায়ার কার্য্যেরই সহায়তা করিব।"

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি পারি না মা।" "কেন পারিবে না।' বলিয়া মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন।

সরযূ অনাবশ্যক উৎসাহ দেখাইল, বলিল—" সেই ভাল, তুমি একা কেন করিবে মা, আমাকে তোমার সঙ্গে লইও, আমিও ঐ কাজ করিয়া বড় সুখী হইব।"

সুশীলা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, কয়দিন হইতে তিনি সরযূর পরিবর্ত্তন নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, বলিলেন—"তোমার ঠাকুর মহাশয়, লিখিয়াছেন, মায়ের পূজার মহাষ্টমীতে তোমায় দীক্ষিত করিবেন।"

সরযূ সোৎসাহে বলিল—"সে বেশ হইবে মা, তুমি একা পূজা কর, অমি বসিয়া থাকি, এ যেন আমার ভালই লাগে না, তোমার সঙ্গে আমিও পূজা করিব।"

মাতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, জোর করিয়া মনের ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন—"এবার আমরা দেশে গিয়া নয়ত কিছুদিন থাকিব, কি বল মা ?"

সরযূ নিষেধ করিল, বলিল—"সেত হইবে না মা, পূজার পরেই আমায় এখানে আসিতে হইবে, মহামায়ার কাজের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

সুশীলা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না ; এই অবুঝ কন্যাটিকে তিনি প্রলোভনের নিকট হইতে দূরে রাখিবার জন্য একেবারে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সরযূ মাতার অভিপ্রায়টা বুঝিয়া লইয়া বলিল—"আচ্ছা মা, বলিয়া কহিয়া রমেশদার বিবাহটা দিতে পার না ?"

"চেষ্টার ত ত্রুটি হইতেছে না।" বলিয়া মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সে মুখে বিষাদও নাই, হর্ষও নাই, শুধু অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। হাত ধরিয়া বলিলেন—"চল মা, মহাভারতের যে স্থানটুকু বাকি রহিয়াছে, পড়িয়া শুনাইবে।"

রাত্রিশেষে সহসা একটা আর্ত্তকণ্ঠের শব্দে সরযূ শয্যা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, নীচে রতনের স্ত্রী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে, রতন মাথায় হাত দিয়া হাহাকার করিতেছিল, সুশীলা একা সান্ত্বনা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সরযূ নামিয়া গেল, দেখিল, গৃহ রক্তাক্ত, মৃতা সোণামণি মাটিতে পড়িয়া আছে, তাহার মুখ দিয়া

যেন একটা দীপ্তি বাহির হইতেছিল। সরযূ একমুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ব্যাকুল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"একি মা ?"

"সোণার জামাই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, পূর্ণগর্ভা সোণার উদরে পদাঘাত করিয়া তাহাকে খুন করিয়া নিজে পলাইয়া গেল।"

সরযূ স্তম্ভিত হইল, সোণার এই আকস্মিক মৃত্যু যেন তাহার মনের উপর জীবদেহের অনিত্যত্ব ঘোষণা করিয়া একটা অবসাদ, একটা গাম্ভীর্য্য আনিয়া দিল। হায়! জীবদেহের একি কুৎসিত পরিণাম, এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য মানুষ না করে এমন কাজত নাই, এই ঘটনাটি যেন সরযূর চোখের উপর কর্ত্তব্যের নূতন চিত্রপট আঁকিয়া লইল, মুহূর্ত্তে তাহার মনের গতি দ্বিধা উৎকণ্ঠা কাটাইয়া ভোগসুখের আশা ভাসাইয়া দিল, সে যেন কেমন হইয়া গেল, কেন এত লোভ, কতক্ষণের জন্য ভোগ সুখ, সোণার মৃত্যু সরযূকে বাঁচাইয়া তুলিল, সুখের পথ দেখাইয়া দিল। সময়ে একটা আঘাতে একটি দৃষ্টান্তেই মানুষের জীবনের গতি এমনই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, যাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অনুভবেও আনা যাইত না। সরযূ ভাবিল, দুদিনের জন্য কণ্টকশয্যা রচনা করিবার প্রয়োজন ?

সকালে মহামায়া আসিয়া সংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, সরযূকে বলিল—"দিদি, অপাত্রে কন্যাসমর্পণের ফলত হাতে হাতে ফলিতেছে, তবু কি অভাগা দেশ ইহা বুঝিবে না, সমাজ স্বাতন্ত্র্য

স্থাপনের চেষ্টা করিবে না, অন্ধ দুর্ব্বল আমরা গতানুগতিক পথে বিচরণ করিয়া পাপতাপ বর্দ্ধন করিব।"

সরযূ দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িল, বলিল—"চল দিদি, তোমাদের কাজই মন দিয়া করিব, ওতেই যদি এ অধম দেশের নির্লজ্জভাব দূর হয়, আরত উপায় নাই, যাহা ধরিয়াছ, তাহা জোর দিয়া শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে।"

সুশীলা আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"এইত পথ মা, তোমার ন্যায় বালবিধবার যে দেশের দশের কাজ করিয়াই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিবে, সনাতন ধর্ম্মের পথে চলিবে, এইত তোমার কাজ। চল মায়া, আজই আমরা তোমাদের কার্য্যে যোগ দিয়া এই মাতৃহীন কন্যাগণের মাতার কাজ করিব।" বলিয়া সরযূর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

যোগেশ, ইন্দুমাধব ও কমলা দাঁড়াইয়াছিল, মহামায়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কমলা গম্ভীর হইয়া বলিল— "একি কাঁদিবার সময় মায়া, সব ঘটনা যে চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাদিগকে শিক্ষার পথ দেখাইয়া দিতেছে। এ অন্ধ দেশ, এমনই ভাবে না দেখাইলেত দেখিতে পাইবে না, শিক্ষার সুযোগ হইবে না। চল মায়া, আমরা এই সতীর দাহকার্য্য শেষ করিয়া চিতাভস্মে আত্মা পবিত্র করি। যান,

যোগেশবাবু, ঘরে ঘরে সংবাদ রটনা করিয়া দিন, কন্যাবিবাহ না দিয়া যদিও রক্ষার পথ আছে, অপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিয়া পথ নাই।"

ইন্দুমাধব অগ্রসর হইলেন, মহামায়ার হাত ধরিলেন, বলিলেন—"দাঁড়াও যোগেশ, ও-কাজ আমরা করিব, তোমাদের কাজ তোমরা কর।" বলিয়া যোগেশের হাতের উপর মহামায়ার হাত রাখিয়া বলিলেন—"এ বন্ধন তোমায় স্বীকার করিতে হইবে যোগেশ ?"

যোগেশ কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া একটা কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিল, কমলা স্থির কণ্ঠে বলিল-"আপনার ত ইহাতে না বলিবার যো নাই যোগেশবাবু, একটি কন্যাও সৎপাত্রে অর্পিত হইল, এ সৌভাগ্য হইতে আপনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না।"

যোগেশ বলিল—"আমার ওপর যে এই কার্য্যের ভার অর্পিত রহিয়াছে।"

সুশীলা ও ইন্দুমাধব একবাক্যে বলিলেন—"সেজন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না বাছা, কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলে কোন বন্ধনইত আটকাইয়া রাখিতে পারে না। আমি জানি, মায়ার ভার মাথায় নিয়াও তুমি আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে। তোমার সাহায্য পাইলে ইহার জন্য যাহা প্রয়োজন, আমরাই যে তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিব।"

মহামায়া ইন্দুমাধব ও সুশীলাকে নমস্কার করিল, কমলার চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, কষ্টে বলিল—"আপনারা প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইতেছেন, মায়া যদি দৃঢ় না হইত, যোগেশ-বাবুর মত পাত্রত ইহার ভাগ্যে জুটিত না।"

মণিবাবু প্রবেশ করিলেন, উচ্চ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"আমি একবাক্যে এই অনুষ্ঠানকে অভিনন্দন করিতেছি, আপনাদের জন্যই আমার মায়ার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল।"

যোগেশ বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল, না বলিবার অবসরও সে পাইল না।

[৪০]

রমেশ সরযূর করাল আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া মনের দ্বিধা কাটাইয়া দিল। কমলার যে আকর্ষণটুকু ধীরে ধীরে হইতেছিল, তাহাই জিহ্বা বাহির করিয়া দাঁড়াইল। অনেক কাল পরে রমেশের মনে পড়িল, যোগেশের ভৎসনার কথা, যোগেশ বলিয়াছিল, "সরযূর পিতা তোমার অত্যাচারেই মারা পড়িলেন রমেশদা?" যদি তাহাই হয়, তবে ত রমেশের আর পাপের সীমা নাই, রমেশ যদি সে মৃত্যুর বিন্দুমাত্র কারণও হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এক কমলার করুণা লাভ ব্যতীত হইতে পারে না।

রমেশের প্রাণ কমলার কল্যাণের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। সরযূকে জীবনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া কমলার কোমল হৃদয়ে নিজের স্থান করিয়া লইবার একটা চিন্তা, একটা সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি যে তাহার ছিল, আজ সরযূর আশা ত্যাগ করিতে গিয়া সেটাও উদ্দাম হইয়া পড়িল, কিন্তু কমলাকে ত সে আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই, সংসারের সকলেই যেমন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহে, কমলাও ত তাহাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কাজেই অগ্রগমন বা পিছনে পড়িয়া থাকা, উভয়ই তাহার সঙ্কটময় হইয়া উঠিল। সরযূ তাহার মাতার সহিত কমলার কার্য্যে যোগদান করিল, পিতাও তাহারই জন্য ব্যস্ত, যোগেশ মহামায়াকে বিবাহ করিল, রমেশ নিতান্তই একা পড়িল, পৃথিবীর অনাবশ্যক ধূলাকাদার মত সে কদিন ধরিয়া এখানে সেখানেই ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছে, যাহাদের লইয়া সে ছিল, তাহারা সকলেই এক একটা কাজ বাছিয়া লইল, রমেশ নিঃসঙ্গ, একাকী, সে এ ভার যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছে না, জীবন ভরিয়া সেত সুখের মুখ দেখে না। সরযূর প্রতি অগাধ প্রেমই যেন ক্রূর গ্রহের মত তাহাকে এমনি অসহায় করিয়া ফেলিয়াছে। রমেশ স্থির করিয়া লইল, কমলাও যখন আমল দিল না, তখন যেদিকে দুচোখ যায় চলিয়া যাইবে, কমলার নিকট হইতে একটা বিদায়, শেষ বারের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য সেদিন গিয়া তাহারই কাছটিতে উপস্থিত হইল।

কমলা সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্রান্ত অলস শরীরে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া অবসাদগ্রস্ত দেহ মন লইয়া উদাস ভাবনায় ছাদের একটা দিক্ ঘেসিয়া বসিয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শান্ত চন্দ্র মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, মন্দ বায়ু সারা গায়ে শৈত্য মাখিয়া কমলার সেই অবসন্ন শরীরের উপর যেন একটা পুলক জাগাইয়া দিতেছিল, সার্থকতায় কমলার তেজোময় মুখখানা আজ হাসিভরা, এতকাল পরে কার্য্য শেষ করিয়া সে যেন পিতার নিকট হইতে জয়ের বর লাভ করিয়াছে, রমেশ মুগ্ধনেত্রে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে এই অসামান্যরূপলাবণ্যা যৌবনোন্নতা কমলার দিকে চাহিয়া রহিল। যেরূপে যোগেশের ন্যায় কঠিন কর্ত্তব্যপরায়ণ মন টলিয়াছিল, রমেশের দুর্ব্বল মন, তাহার মধ্যে একেবারে তলাইয়া গেল, পুণ্যতীর্থের পবিত্র মন্দিরের মত, দেবা-মূর্ত্তির নিপুণ বর্ণসমাবেশের মত, কর্ত্তব্যে জাগরূক প্রশস্ত হৃদয়ের মত, কমলার রূপ কার্য্য আজ রমেশকে চাপিয়া ধরিল, এক বিন্দু মমতা, এক নিমেষের বন্ধন, আজ যেন পাহাড় হইয়া উঠিল, সেই ধবধবে বস্ত্র পরিহিতা কমলার মূর্ত্তি ধ্যানগম্য দেবতার ন্যায় রমেশকে আলিঙ্গন করিয়া যেন রমেশের পাপতাপ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। দয়ায় দেবী, স্নেহে মাতৃসমা, উপদেশে মন্ত্রী, শ্রদ্ধায় ভগিনী, বিপদে বন্ধু, সুখে সহচরী, দুঃখে পত্নী, আহারে তৃপ্তি, নিদ্রায় আরাম, জাগ্রতে সুখস্মৃতি, কল্যাণে

মঙ্গলময়ী দেবী, পূজায় জগদ্ধাত্রীর মত কমলা আজ রমেশকে এক মুহূর্ত্তে জগতের কাছ হইতে, প্রেমের কাছ হইতে, পরিতাপের কাছ হইতে, উন্মাদনার কাছ হইতে ছিনাইয়া আনিল। রমেশ আর ধৈর্য্য ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, মুক্তকণ্ঠে বড় জোর করিয়া ডাকিল—"কমলা?"

কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রমেশের দিকে তাকাইল, কোমল প্রেমময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন রমেশ বাবু?"

সেই গর্ভভরালসা গজবধূর ন্যায় মৃদু মধুর গতিভঙ্গী, তৃষিতা হরিণীর ন্যায় লোলুপ দৃষ্টি, বীণার মৃদু ঝঙ্কারের ন্যায়, নূপুর নিক্কণের ন্যায়, বসন্ত কোকিলের স্খলিত কূজনের ন্যায়, মত্ত মধুব্রতের গুঞ্জনের ন্যায় কমলার স্বর লহরী রমেশের কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে ধমনিতে ধমনিতে ঘাত প্রতিঘাত করিয়া গেল, রমেশ রোমাঞ্চিত পুলকিত হইয়া উঠিল, কঠোর সংযমে সংযত হইয়া বলিল—"তোমার পিতৃকার্য্যত সম্পন্ন হইল, এবার আমি চ ললাম;"

কমলা আকাশের দিকে চাহিল, সেই মেঘমুক্ত আকাশ যেন আশীর্ব্বচন লইয়া তাহার দিকে সঙ্কেতশব্দে লোটাইয়া পড়িতেছিল। সে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল, বলিল—"আমার দুরদৃষ্ট লইয়া আমি যেখানে সেখানে যাইব, সেজন্য কিছু ভাবিবার নাই, তোমার কাছে শেষ অনুরোধ, জ্ঞানে অজ্ঞানে অপরাধ যাহা করিয়াছি, ক্ষমা করিবে!"

"ক্ষমা, সে না হয় যে কোন পক্ষ হতে যে কোন সময়ে হইতে পারিবে, তার জন্যে অনাবশ্যক ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই, কিন্তু আপনি যে আমার জন্য এত পরিশ্রম করিলেন, তার প্রতিদান দি এমন ত আমার কিছু নাই, অকৃতজ্ঞ বলিয়া যেন তিরস্কার করিবেন না।"

রমেশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, চাহিয়া দেখিল, কলিকাতার মস্ত সহরটা গায়ে জোৎস্না মাখিযা যেন উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। গলির রেখা ক্ষীর্ণ হইয়া যেখানে বড় রাস্তায় পড়িয়াছে, সেখানে মুক্ত আকাশে সাদা পাথরের কোণে দীপের মত তারাগুলি হীনপ্রভ হইয়া মিটিমিটি জ্বলিতেছিল, জ্যোস্নোস্নাত পৃথিবী যেন সতরঙ্গ উচ্ছ্বাসে আপনার যৌবনদীপ্ত জীবন লইয়া অভিসারোন্মুখী রমণীর ন্যায় প্রিয় সন্ধানে বাঞ্ছিতের উদ্দেশে লাঞ্ছনাগঞ্জনার কথা ভুলিয়া মেঘপালিতা তটিনীর অনির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিয়াছে, "অকৃতজ্ঞ তোমাকে কেন হইতে হইবে কমলা, আমিই যে তোমার মস্ত দুঃখের কারণ।" বলিয়া রমেশ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল।

"কিন্তু তারেও এত সুখ।" বলিয়া কমলা মধ্যপথে থামিয়া গেল। রমেশ সাহস পাইল, গম্ভীর হইয়া বলিল—"তোমার মত যারা ভাল ছাড়া মন্দ জানেই না, তারা যে দুঃখকেও সুখ বলিয়া গ্রহণ করে, আমি কিন্তু তোমার সুখের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই।"

কমলার হৃদয় বলিতেছিল "তুমিই আমার সুখ, সর্ব্বস্ব, তোমার কার্যমাত্রই যে সুখের, আমার জন্য আবার আলাদা করিয়া কোন্ কাজ করিতে হইবে।" প্রকাশ্যে বলিল—"ও সকল ভদ্রতার কথা, বস্তুত ঋণ যে কাহার কতখানি, তাহাত অবিদিত নাই, আর কেই আমার জন্য এতটা করিত, আমি তাই, কোন রকমেই আপনাদিগের কিছু করিতে পারিলাম না।"

"করিতে ত পার।" বলিয়া রমেশ কুণ্ঠিত মুখ নীচু করিল।

"কি করিতে পারি রমেশবাবু, অবলা আমি, আমার সাধ্যই বা কতখানি।"

"তুমি পার কমলা, আমার অভিসপ্ত জীবনের বিস্বাদ কমাইতে যদি কাহারও শক্তি থাকেত সে তোমারি আছে।"

কমলার মন আনন্দে আহ্লাদে আত্মহারা হইতেছিল, চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার ?"

"হাঁ তোমার, আজ আর পৃথিবীতে আমার বলিয়া কেহ নাই, একমাত্র তুমি আছ, ইচ্ছা করত, ঘরে স্থান দিতে পার, নয়ত যে পথে চলিয়াছি, সে পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে।"

কমলা কাঁপিয়া উঠিল, পিতার অন্তিম রোগপাণ্ডুর মুখ তাহার মনে পড়িল, নিমেষহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"পিতঃ, তুমিইত আমায় সঁপিয়া দিয়া গিয়াছ, তবে আজ বল দাও।" কমলা বল পাইল, রমেশের দিকে দৃষ্টি করিল।

রমেশ বলিল—"পাপ আমি অনেক করিয়াছি কমল, সে কে
তোমার কাছে নহে, মনের কাছে যে কত পাপী, সে আমিই জ
এ পাপ কি তুমি ধুইয়া দিতে পার না।"

কমলা আবার বলিল—"আমি পারি ?"

"পার" বলিয়া রমেশ অগ্রসর হইল, কমলার হাত ধরিতে ে
অনির্দ্দেশ্য গতিতে যেন হাতখানা হাতের মধ্যে আসিয়া উ
অধীরকণ্ঠে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"বল কমল, আমার এ ে
ভার তুমি লইবে।" কমলা পুলকে রোমাঞ্চিত হইল, মুখের ক
জড়াইয়া আসিতেছিল, এ সুখস্পর্শ তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ক
দিল, রমেশ আবার বলিল—"তোমায় উপেক্ষা করিয়া আমি
পাপ করিয়াছি—" কমলা বাধা দিল, বলিল—"ওকি কথা, তো
আবার পাপ।" রমেশ কমলার মুখের দিকে চাহিল, জিজ্ঞ
করিল—"বল বিবাহ করিবে।" "বন্ধনে প্রয়োজন নাই দেবতা
বলিয়া কমলা একপা সরিতে গেল, রমেশ হাত ছাি
না, জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল—"কারণ
কমলা হাত জোর করিয়া ধরিল, অবসন্ন শরীরের ভার রমে
উপর দিয়া সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"ভয় হয়, কি জানি পিতা য
ক্ষমা না করেন।"

রমেশ হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, বাত্যাকম্পিত তরুর ম
কমলা পড়িয়া গেল, ইন্দুমাধব উপস্থিত হইয়া কমলাকে ধর

উঠাইলেন, রমেশের হাতে কমলার হাত রাখিয়া বলিলেন—"পিতা ক্ষমা করিয়াছেন মা, তোমার পিতার বন্ধু হইলেও আমি তোমার পিতৃস্থানীয়, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এ বন্ধন তোমার সুখের, সৌভাগ্যের, যশের হইবে, এ বন্ধনই তোমায় মুক্ত করিবে, পবিত্র করিবে, জগতের আদর্শ করিবে, আর যেন না বলিও না?" বলিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি চলিয়া গেলেন। রমেশ গাঢ় আলিঙ্গনে কমলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, সত্যই সে স্পর্শ যেন তাহার চিরদগ্ধ মরুপ্রায় হৃদয়কে শীতল করিয়া দিল, বলিল—"আর ত কোন দ্বিধা নাই কমল?"

কমলা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, "আমার যাহা ছিল তাহাত অনেক দিনই তোমায় দিয়া রাখিয়াছি।" বলিয়াই সে থামিয়া ·েল, এত বড় সুখের আঘাতটা তাহার হৃদয় মানিল না, চোখ বাহিয়া উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া প.ড়িয়া রমেশের বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল,. রমেশ সেই অশ্রুধারাকে পূত মন্দাকিনী ধারার মত বুক পাতিয়া লইল। সে তাহার নিজের অজ্ঞাতে জগতের অজ্ঞাতে দেবতা সাক্ষী করিয়া চিরমুক্তের মত মুক্ত আকা র তলে দাঁড়াইয়া চন্দ্রকরস্নাত, স্বেদসিক্ত, আবেগকম্পিত, পুষ্পপুটতুল্য কমলার অধর দেশে কম্পিত অধর স্থাপন করিল।

সমাপ্ত